দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ • ৯ ম সংখ্যা •২৯ জুলাই ২০২৪

ভিতরের পাতায়

- শুধু বিভ্রান্তিকর নয়,
  প্রতারণা ও ক্ষমতা রক্ষা করার বাজেট ২
- দেশবাসীর আয় কি বাড়ল ? সর্বশেষ সমীক্ষা কি বলছে ? ৪
- ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একাধিক অসুখে ভুগছে ৫
- ভারতের ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অনৈতিক কাজ ৮
- ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে ও মানবতার পক্ষে রায় ১০
- ২০২৪ ক্ষমতায় এনডিএ;
  হিন্দু জাতীয়তাবাদ কোথায় ? ১২
- জরুরি অবস্থা বনাম মোদী জমানা এবং ফ্যাসিবাদ ১৪
- ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ১৯৪৭ -২০২৪ ১৬
- বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে
  অন্তত ২০০ জনের মৃত্যু ১৯
- গভীর সঙ্কটে বাংলাদেশ ঃ কোটা সংস্কার আন্দোলন বাহন মাত্র, আসল লক্ষ্য ছিল হাসিনা সরকারের পতন ২১
- বাংলাদেশের কোটা আন্দোলন ও কিছু আনুষঙ্গিক কথা ২৩
- আম্বানিদের বিবাহ অনুষ্ঠান বৈভবের নির্লজ্জ্ব প্রদর্শনী ২৬
- 'নাগরিক' স্মৃতিচারণা ঃ
  মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত ২৯

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com

ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

দেশে কি নাৎসি জার্মানির পদধ্বনি ?

উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার জুলাই মাসের ১৭ তারিখে এক নির্দেশ জারি করে প্রথমে মুজফফর নগরে ও পরে গোটা উত্তরপ্রদেশে আসন্ন কাঁওয়ার যাত্রা উপলক্ষে যাত্রাপথে সব দোকানের মালিক ও কর্মচারী দের ফোন নাম্বার আবশ্যিক করেছিল। সেই নিয়ে প্রবল সমালোচনা হলেও যোগী সরকার পিছু হটেনি।এরপর তাকে অনুসরণ করে একই নির্দেশ জারি করে উত্তরাখণ্ডের পুষ্কর সিং ধামি সরকার। এরপর এই বিভেদের পথ অনুসরণ করে মধ্যপ্রদেশের উজ্জ্বয়িনী পুরসভা। তারা নির্দেশ দেয় উজ্জ্বয়িনীর মহাকাল মন্দিরের পথে সমস্ত দোকানদারকে নাম , ফোন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এই সব নির্দেশের আসল উদ্দেশ্যক মুসলমান দোকানদারদের চিনিয়ে দেওয়া ও তাঁদের দোকানে হিন্দুরা যাতে না যায় সে জন্য চাপ সৃষ্টি করা। কাঁওয়ার যাত্রা বা মহাকাল যাত্রা উপলক্ষ্যে যুগ যুগ ধরেই যাত্রা পথে সামান্য কিছু মুসলমান দোকানী দোকানপাট নিয়ে বসে। এই নিয়ে কোনোদিন কোনও সমস্যা হয় নি। যার ইচ্ছা ওই দোকানে যায় , অনেকে অন্যত্র দোকানে যায়। তীর্থ যাত্রীরা নিরামিষাশী এটা সব দোকানীই জানেন।তাই তারা নিরামিষ রান্না করেন, এমনকি পিয়াঁজ রসুন পর্যন্ত তারা রান্নায় ব্যাবহার করেন না।যাদের মনের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ , তাদের সাম্প্রদায়িক গোলোযোগ বাঁধিয়ে মানুষকে বিভক্ত করাই প্রধান কাজ।এর আগে কর্ণাটকের বিজেপি সরকার হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের মেলায় মুসলমান দোকানীদের বিক্রিবাট্টা বন্ধ করে দিয়েছিল। এরা এতটাই অমানবিক।

যাই হোক উপরোক্ত অমানবিক নির্দেশের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেন অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রটেকশন অফ সিভিল রাইটস ,সাংসদ মহুয়া মৈত্র, অধ্যাপক অপূর্বানন্দ ঝা ও লেখক আকর প্যাটেল। সুপ্রিম কোর্টের কোর্টের বিচারকদ্বয় হৃষিকেশ রায় ও এস.ভি.এন. ভাট্টি তাঁদের রায়ে বিজেপি পরিচালিত সরকার ও সংস্থার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেন। তাঁরা বলেন ওই নির্দেশ ছিল দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের ওপর হস্তক্ষেপ। ওই নির্দেশ সংবিধান প্রদত্ত সমতার অধিকারের বিপক্ষে ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্যমুলক। পুনরায় শুনানি ছিল ২৬ জুলাই। এইদিন বিচারকরা উত্তরপ্রদেশ সরকারকে পুনরায় তীব্র তিরস্কার করে তাদের কাজকে নাৎসি জার্মানির বন্দী শিবিরের সঙ্গে তুলনা করেন। ওই সময়ে হিটলার প্রশাসন ইহুদীদের হলুদ ব্যাজ দিয়ে সনাক্ত করে দিত।ক্যাথলিকরা ইহুদীদের দোকানপাট বয়কট করত। বর্তমান বিজেপির সরকার কি সেই কাজ করতে চাইছে ?

মাননীয় বিচারকরা সরকারি নির্দেশ ৫ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করে দেন।

শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, প্রতারণা ও ক্ষমতা রক্ষা করার বাজেট

অমিতাভ সিংহ

মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করে বোকা বানাতে হয় তা আমাদের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সিতারমন গত কয়েক বছরে বেশ ভালভাবেই শিখে ফেলেছেন। বর্তমানে দেশের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা হল গত ৪৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বেকারত্ব, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের ক্রমাগত মুল্যবৃদ্ধি এবং ব্রিটিশ জমানার চেয়েও বেশী অসাম্য। একটি সরকারের এইসব বিষয়গুলিতে জোর দিয়ে বাজেট প্রস্তুত করাই ছিল প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সপ্তমবার বাজেট পেশ করে রেকর্ডের ভাগীদারি হলেও অর্থমন্ত্রী ব্যর্থতার যে আরেক রেকর্ড করে ফেললেন তা স্পষ্ট হয়ে গেল। জানতে ইচ্ছে করছে তার অর্থনীতিবিদ স্বামী পরাকলা প্রভাকর এই বাজেটকে কি বলবেন, যিনি গত কয়েকবছর ধরেই মোদী সরকারের আর্থিকনীতি সহ সরকার চালানোর পদ্ধতিকে বার বার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন উক্ত তিনটি বিষয়কে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে এক বিভ্রান্তিকর ভাষণ দিয়ে গেলেন।সেবিষয়ে পরে আলোচনা করছি।এককথায় এই বাজেট বিশেষ দুটি রাজ্যের বাজেট বললে বোধহয় ঠিক বলা হয়।সারা ভাষণে শুধু অন্ধ্র আর বিহার। যেন এই দুটি ছাড়া আর কোনও রাজ্য নেই দেশে।সরকার বাঁচানোর জন্য যদি একটা দল বা সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চিতায় তুলতে হয় তাহলে সেই সরকারের থাকার কি দরকার? দুই শরিক বিহারের জেডিইউ ও অন্ধ্রের তেলেগু দেশমকে সন্তুষ্ট করতে এই সরকার যা করল তা ঐতিহাসিক। অর্থমন্ত্রী বোধহয় এই সীমাবদ্ধতা বুঝেই সবথেকে কম সময়ে এবারের ভাষণ শেষ করলেন।

সরকারের আর্থিক সমীক্ষা জানিয়েছে কাজের বাজারের চাহিদা পূরণ করতে আগামী সাত বছরে দেশে বছরে ৭৮.৫ লক্ষ চাকরি তৈরী করতে হবে। মোটামুটি একই সংখ্যক যুবক যুবতী প্রতি বছর কাজের বাজারে নিয়োজিত হয়।এদের নিয়ে সরকারের কোন হেলদোল কোথায়? কোথায় সরকারি ক্ষেত্রে দশ লক্ষ ফাঁকা পদ পূরণের চেষ্টা। সবকিছু বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে তুলে দিয়ে তিনি দায়িত্ব ও কর্তব্য সেরে হাত ধুয়ে ফেললেন। দেশের পাঁচশটি সংস্থায় পাঁচ বছরে এককোটি যুবক যুবতীকে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগ করতে সরকার সাহায্য করবে।এর অর্থ এক একটা সংস্থাকে বছরে চার হাজার করে পাঁচ বছরে কুড়ি হাজার শিক্ষানবিশ বা ইন্টার্ন নিয়োগ করতে হবে। এটা কি বাস্তবে সম্ভব? তথ্য অনুযায়ী দেশের সেরা পাঁচশো সংস্থার মধ্যে ৩৬৩ টি সংস্থায় দশ হাজারের কম কর্মী। তারাই কিনা পাঁচবছরে কুড়ি হাজার ইন্টার্ন নিয়োগ করবে? তাদের চাকুরির বাজারে তৈরী করার জন্য খরচ করবে? কেনই বা তারা নিজেদের গাঁটের কড়ি এইখাতে খরচ করবে?

তাছাড়া এই প্রকল্পে শিক্ষানবিশ হতে গেলে বেশ কিছু কঠোর শর্তও আছে, যেমন এদের পরিবারের কেউ আয়করের আওতায় থাকলে চলবে না। পরিবারের কেউ সরকারি চাকুরি করলে সে বাতিল ইত্যাদি। এসব শর্ত পূরণ করে ইন্টার্ন হওয়া বহু যুবক যুবতীর কপালে লেখা থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। আসলে এই প্রকল্পটি কংগ্রেসের গত লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহার থেকে চুরি করতে চাইলেও অযোগ্যতার জন্যে ঠিকঠাক রূপ দিতে ব্যর্থ। একই কথা বলা যায় কংগ্রেসের ইস্তাহারে বর্ণিত আন্‌জেল ট্যাক্স চুরি করার এক অসম্পূর্ণ প্রয়াস।

আবার দেখুন বাজেটে বলা হল বেসরকারি সংস্থাগুলিকে এক লক্ষ টাকা বেতনের ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা করে ভর্তুকি দেবে সরকার। যে সংস্থা লক্ষ টাকা বেতন দিতে পারবে তার ভর্তুকির কি দরকার। তাছাড়া চাকুরি হলে তবে তো টাকা পাবে,আর সে সুযোগ সৃষ্টির উপায় হল কই? কর্মীপ্রতি যে টাকা নিয়োগকর্তার জমা দেওয়ার কথা ইপিএফের কাছে সেই টাকাটাও নাকি সরকার চার বছর ধরে দিয়ে দেবে।ভাবখানা এই যে পিএফ দিতে পারবে না বলেই নিয়োগকর্তা দরকার থাকলেও চাকরি দিতে পারে না? যে ইপিএফ তাদের গ্রাহকদের নূণ্যতম পেনশন এক হাজার টাকা দিতে নাভিশ্বাস তুলছে তারা নাকি নতুন চাকুরি প্রাপকদের এক মাসের বেতন দেবে! এটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া কি বলবেন? অর্থমন্ত্রী ভাবের ঘরে চুরি করছেন তা তিনি নিজেও জানেন।

এটা মনে রাখতে হবে ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের প্রায় নব্বুই শতাংশ কর্মসংস্থান হয় কৃষিক্ষেত্রে ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে।রাজমিস্ত্রী,কল সারাই, গৃহসহায়ক, রাঁধুনি, নার্স, আয়া, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী, ছুতোর, কামার, দর্জি, তারা সবাই এই সংগঠিত ক্ষেত্রের বাইরে।তাদের নূণ্যতম মজুরি বাড়ানো প্রয়োজন ছিল, তার কোন চেষ্টা দেখা গেল কি? কৃষি মজুরি

বাড়ানোর দীর্ঘদিনের দাবী মানা হল কই? নূণ্যতম সহায়ক মূল্যের প্রতিশ্রুতি যা দেওয়া হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নেই বাজেটে। মূলতঃ বড় চাষীদের ও বড় পুজির কৃষি ব্যবসায়ী বা কর্পোরেটদের সুবিধার জন্য ফসলের মজুতকরণ ও বিপণন বা গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের জন্য ২৮৬০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বলা হচ্ছে এমএসএমই গুলিকে বন্ধকহীন ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা সহজতর করা হয়েছে। কিন্তু তারা কতটা কর্মসংস্থান করতে পারবে? সারের ভর্তুকি বা কম মূল্যে বিদ্যুৎ দিলে চাষের খরচ কমে। তাহলে কৃষিপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রনে আনা যায়। জিনিসপত্রের দাম কমানের কোন দিশাই এই বাজেটে দেখা গেল না। বাস্তবে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে ও বেকারত্ব কমবে না এই বাজেটের ফলে। কিন্তু দাম কমানো হল সোনা রূপা বা প্ল্যাটিনামের মত মূল্যবান ধাতুর। দেশের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের এতে কি লাভ হল?

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে কবছরে তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে তা কভিদের সময় প্রমাণ হয়ে গেছে।আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প কখনই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না।কর্পোরেটদের সুবিধা দিতে আয়ুষ্মান ভারত না এনে দরকার ছিল স্বাস্থ্য বরাদ্দ বেশ কিছুটা বাড়ানো। ২০১৭ সালে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি সুপারিশ করেছিল জিডিপির অন্তত ২.৫ শতাংশ এই খাতে ব্যয় করতে হবে।এবারে তার কাছাকাছি বরাদ্দ করার দরকার ছিল, কিন্তু তা বাজেটে দুই শতাংশেরও কম করা হল। এর মধ্য আবার আছে পানীয় জল, শৌচনিকাশি, শৌচাগার নির্মাণ ইত্যাদিতে। সরকারি পরিকল্পনার ফলে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এদেশের মানুষের চিকিৎসা খাতে ব্যয় বেশী। চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিরাট সংখ্যক মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়েন।এমন হলে দেশে সুস্থ ও কর্মঠ মানবসম্পদ তৈরী হবে কিভাবে? শুধু বেসরকারি ক্ষেত্রর ওপর দায়িত্ব দিলে চলবে? দরকার ছিল জনস্বাস্থ্য ও সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বহুল সংস্কার। তা আর হল কই? হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ানের অভাব। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব,উন্নত পরীক্ষাকেন্দ্র নেই। এগুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ কোথায়?

শিশুপুষ্ঠির দিকটাও যে সরকারের নজরে নেই তা বরাদ্দর বহর দেখলেই বোঝা যায়। ৪০ শতাংশ অপুষ্ট শিশুদের নিয়ে অমৃতকাল উদযাপন করবে দেশ।

বার বার ঋণ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। করোনার আগে যারা শিক্ষা ঋণ নিয়েছিলেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা শোধ দিতে পারেন নি, তাদের ঋণ মকুব করা যেতে পারত। এই বাজেটে দরিদ্র মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, দিনমজুর অর্থাৎ যারা আয়কর দেন না তাদের জন্য কোন সুবিধা বা আশার আলো দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন এম ফিল করা অর্থমন্ত্রী। গত ছয় বছর শ্রমিকদের একইরকম মজুরি। কংগ্রেস নূণ্যতম মজুরি দৈনিক ৪০০ টাকা করার কথা বলেছিল।

শুধু কংগ্রেসসহ বিরোধীরা নয় সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবারও অগ্নিপথ প্রকল্প তুলে আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে। অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধীতাকে গুরুত্ব না দিয়ে এখনও দেশের সুরক্ষা নিয়ে সরকার ছেলেখেলা করছে। দেশে দুহাজার কিমি জায়গা দখল করে নেওয়ার পর চিনকে জবাব দেওয়ার বদলে প্রতিরক্ষা বাজেট কমানো হল মোট বাজেটের ৯.৬% থেকে ৯.৪%।

এবার আসি আয়কর ব্যবস্থার বদলে।স্টান্ডার্ড ডিডাকশন ২৫০০০ টাকা বাড়িয়ে চাকুরিজীবীদের কর সাশ্রয় হয় ৫% অর্থাৎ ১২৫০ টাকা বছরে। শর্ট টার্ম মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে ৫% কর বাড়ানো হয়েছে,আর লং টার্ম মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে ২.৫% বাড়ানো হলেও তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী কারণ সূচক বা ইন্ডেক্সেশনের সুবিধা তুলে দেওয়া হয়েছে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝা যাবে।ধরুন আপনি একটা বাড়ী বা জমি কিনলেন ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে যার দাম ৫০ লক্ষ টাকা। আজকের দিনে এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় তা বিক্রি করলেন। তাহলে আপনাকে আয়কর দিতে হবে ১ কোটি টাকার ওপর ১২.৫% হারে মোট ১২,৫০,০০০ টাকা। কিন্তু আগের নিয়মে সূচকের সুবিধা নিয়ে মূলধনী লাভ হবে ১৭,৫১,৮২৫। কর হবে উক্ত টাকার ওপর ২০% অর্থাৎ ৩৫০,৩৬৫ টাকা। তফাৎ হল ৮৯৯,৬৩৫ টাকা। তার মানে মূল্যবৃদ্ধির জন্য আপনি লাভের গুড় খেতে পারলেন না,গুড় খেল সরকার।

মূল্যবৃদ্ধ রোধ করা নিয়ে সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স বর্তমানে ৩.৫% ও কস্ট প্রাইস ইন্ডেক্স ৯.৪%। যে সরকার দেশের মানুষের কল্যাণ করার চাইতে ক্ষমতায় থাকা বেশী দরকার বলে মনে করে তারা তো এইপথেই হাঁটবে। নাহলে নিজেদের দল যে সব রাজ্যে ক্ষমতায় আছে , তাদের জন্যও চিন্তা করে না,শুধু মোদী শাহ নিজেরা ক্ষমতায় থাকতে চায় শুধু দুই শরিকের পায়ে ধরে।

শিক্ষায় বাজেট কমানো ও দেশবাসীকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখা এই সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। গত বজেটের ১৬০,৪৭০ কোটি টাকার মধ্যে খরচ করেছে মাত্র ১০৮,৮৭৮ কোটি টাকা। এবারে এই খাতে বরাদ্দ আরো কমেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে দেশে পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশী শিশু লিখতে ও পড়তে বা সাধারণ অংক কষতে পারে না, তাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ দক্ষতা বাড়িয়ে স্কিলড জবের উপযোগী করে তোলা বেশী দরকার ছিল না কি?

স্কুল শিক্ষায় গতবারের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১১৬৪১৭ কোটি টাকা। আট হাজার কোটি টাকা কমিয়ে এবার তা হয়েছে ১০৮৮৩৮ কোটি টাকা। সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে?

নিট পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষাগুলিতে দুর্নীতি রোধে একটাও শব্দ খরচ করেন নি মন্ত্রীমশাই।

এককথায় বলা যায় এবারের বাজেট কুর্সি বাঁচানোর জন্য গোবর গোমূত্র সরকারের বাজেট, যা দেশকে কয়েক দশক পেছিয়ে দেবে।

দেশবাসীর আয় কি বাড়ল? সর্বশেষ সমীক্ষা কি বলছে?

অশোক সরকার

দারিদ্র্যের একটা মাপকাঠি হল একজন বা একটি পরিবার মাসে কত আয় করছে তার হিসাব। আমাদের দেশে সিংহভাগ লোকের আয় মাপা কঠিন, তাই কতটা খরচা করতে পারছে, তার থেকে আয়ের ধারণা তৈরি হয়। সেই পরিমাপ যদি কোন এক বিশেষ মাত্রার নীচে হয়, তাহলে সে গরিব। কতটা নিচে, তার উপর নির্ভর করে সে অতি গরিবও হতে পারে। আর যদি এই মাসিক খরচার হিসাব প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার জন্য নেওয়া হয় তাহলে জানা যায় সমাজের কোন অংশের আর্থিক অবস্থা কি রকম। আরও জানা যায় অসাম্যের গভীরতা। সবচেয়ে কম আয়ের সংসার আর সবচেয়ে বেশি আয়ের সংসারের মধ্যে ফারাক কতটা।

২০২২-২৩ সালে ঘরোয়া খরচার (Household Consumption Expenditure Survey) একটা হিসাব নেওয়া হয়েছে। এই হিসেব শেষ নেওয়া হয়েছিল ২০১১-২০১২ সালে, আর মাঝখানে ২০১৭-১৮ সালের হিসাবটি সরকার চাপা দিয়ে দিয়েছিল, একথা সবারই জানা। কাজেই বর্তমানের হিসাবটি নিয়ে ঔৎসুক্য থাকবেই। অসাম্য কি কমল? সমাজের দুর্বল বর্গের অবস্থান কি সত্যিই বেশি কিছুটা পাল্টালো? মধ্যম বর্গের অবস্থা কি? ইত্যাদি প্রশ্ন উঠবেই।

এই আলোচনায় ঢুকতে গেলে একটা ধারণা স্পষ্ট করে নিতে হয়। সেটা হল decile। দেশের সব রকম পরিবারকে দশটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ দেশে যদি ১০০টি পরিবার থাকে তাদের দশ ভাগে ভাগ করা হবে। প্রতিটি ভাগ হল একটা decile। দশটি ভাগ কি করে করা হবে? এই ১০০টি পরিবারের ঘরোয়া ব্যয় যদি ০ থেকে ১০০০ টাকা হয়, তাহলে শূন্য থেকে শুরু করে ১০০টাকার মধ্যে যতজন পাওয়া গেল তারা হল প্রথম decile। ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত যতজন পাওয়া গেল তারা হল দ্বিতীয়decile। প্রতিটি decile-এ জনসংখ্যা সমান হবে না।

দেখা যাক ২০২২-২৩ সালের ঘরোয়া ব্যয়ের হিসাব কি বলছে। তবে একটু ঝামেলা আছে। বলা হচ্ছে ব্যয় কিন্তু রেশনের চাল-গমকে সেই হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ গরিব পেনশন কেউ পান সেটাকেও হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ১০০দিনের কাজের টাকাও ! এটা ২০১১-২০১২-র হিসেবে ছিল না। তবে তাকে বাদ দিয়ে দেখার সুযোগ আছে। আমরা বাদ দিয়েই দেখব। আরও ঝামেলা হল ২০১১-১২ আর ২০২২-২৩ এর সমীক্ষার নমুনা চয়নের ফরমুলায় বড় রকমের ফারাক হয়ে গেছে। যেমন বর্তমানের সমীক্ষায় সচেতনভাবে কিছু শহরের লাগোয়া গ্রামীণ ব্লক ও গ্রাম চয়ন করা হয়েছে, যেটা আগের সমীক্ষায় ছিল না। এই ব্লক ও গ্রামগুলিতে মানুষের আয় অন্য গ্রামের তুলনায় যে অনেকটা বেশি তা আর বলে দিতে হয় না। তারপর গ্রামে জনসংখ্যাকে জমির মালিকানা অনুযায়ী আর শহরে গাড়ির মালিকানা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মাত্র তিন ভাগে ভাগ করলে কি হয়? যদি বলা হয় জমির মালিকানা ০-৫ একর, ৫-১০ একর আর ১০ একরের বেশি, এই তিনটি ভাগ, তাহলে কি হবে? যেহেতু ০-৫ একর এর মধ্যেই প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ রয়েছেন, এদের এক বর্গে ফেলে তার থেকে নমুনা নিলে গরিব অতি গরিব ও গরিবি রেখার ঠিক উপরে যারা তাদের অংশ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হবে না। একে বলে সচেতনভাবে গরিবদের গুনতি কম করা, বা planned under counting of the poor। শহরেও তাই। যাদের গাড়ি নেই, যাদের ১০ লাখ টাকার কম দামের গাড়ি আছে আর

যাদের ১০ লাখ টাকার বেশি দামের গাড়ি আছে, এই তিন ভাগে শহরের জনসংখ্যাকে ভাগ করা হয়েছে। গাড়ি আছে এমন জনসংখ্যা শহরে ১০-১৫ ভাগের বেশি নয়, বাকি ৮৫ ভাগকে যদি একই বর্গে ফেলে তার থেকে নমুনা নেওয়া হয়, তাতে শহরের গরিব আর নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের গুনতিও কম হয়ে যায়।

অর্থাৎ এই সমীক্ষায় সচেতনভাবে গরিবের গুনতি কম হয়েছে। এই সমস্যাকে মেনে নিয়ে যদি ২০১১-১২ আর এখনকার সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মেলাই তা হলে কি দেখব ?

মাথা পিছু ঘরোয়া খরচা ২০১১-২০১২ আর ২০২২-২০২৩ (টাকার হিসাবে)

Decile	২০১১-১২	২০২২-২৩ (ঐ সালের দামে)	২০২২-২৩ (২০১১-১২এর দামে)	২০১১-১২	২০২২-২৩ (ঐ সালের দামে)	২০২২-২৩ (২০১১-১২এর দামে)
	গ্রামে	গ্রামে	গ্রামে	শহরে	শহরে	শহরে
০১	৫৯৪	১৫৭৮	৮৫৫	৮০৫	২০৩৪	১০৫২
০২	৭৮৩	২১১২	১১৪৪	১১১৮	৩১৫৭	১৬৩৩
০৩	৯০৫	২৪৫৪	১৩৩০	১৩৬৩	২৭৬২	১৯৪৬
০৪	১০১৮	২৭৬৮	১৫০০	১৬২৫	৪৩৪৮	২২৪৯
০৫	১১৩৬	৩০৯৪	১৬৭৬	১৮৮৮	৪৯৬৩	২৫৬৭
০৬	১২৬৬	৩৪৫৫	১৮৭২	২১৮১	৫৬৬২	২৯২৮
০৭	১৪২৭	৩৮৮৭	২১০৬	২৫৪৮	৬৫২৪	৩৩৭৪
০৮	১৬৪৫	৪৪৫৮	২৪১৫	৩০৬৩	৭৬৭৩	৩৯৬৯
০৯	২০০৮	৫৩৫৬	২৯০২	৩৮৯৩	৯৫৮২	৪৯৫৬
১০	৩৫১৯	৮৫৭০	৪৬৪৩	৭৮১৬	১৬৬১১	৮৫৯১

এই সারণী নিয়ে তিনটে স্পষ্টীকরণ দেওয়া দরকার। এক, ঘরোয়া খরচা বলতে বোঝায় খাওয়া দাওয়া, জামা কাপড়, শিক্ষা স্বাস্থ্য, যানবাহন ও আনুসাঙ্গিক খরচা। দুই, প্রতিটি Decile -এ টাকার অঙ্কটি ওই Decile-এর সব মানুষের খরচার (অর্থাৎ আয়ের) অঙ্কের গড়, আর তিন, খরচা করার ক্ষমতা কতটা বাড়ল, তা দুভাবে মাপা হয়। এক যে বছর মাপা হচ্ছে সেই বছরের টাকার ক্রয় ক্ষমতায়, আর যে বছরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সেই বছরের টাকার ক্রয় ক্ষমতায়। গ্রামে এখানকার দামে হিসেব করলে, প্রথম দুই Decile-এর মানুষের খরচার ক্ষমতা ১.৬ গুণ করে বেড়েছে, তার পরে সবার ২.৭ গুণ করে বেড়েছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিকে ধরলে দেখছি সব বর্গেরই খরচার ক্ষমতা দশ বছরে মাত্র ১.৪ গুণ বেড়েছে। শহরের কাহিনীও প্রায় একই রকম।

কিন্তু আমরা উপরের তালিকায় কোন decile-এ কজন মানুষ আছেন তা তো বলিনি। সংক্ষেপে তা বললে দেখা যাচ্ছে এখনো দৈনিক ১০০টাকার কম খরচা করতে পারে এমন মানুষ জনসংখ্যার ৩৩.৮ ভাগ, দৈনিক ১০০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারে এমন মানুষ ৪৭.৩ ভাগ, ২০০ থেকে ৫০০ টাকা দিনে খরচা করতে পারে এমন মানুষ ১৭ ভাগ, আর দৈনিক ১০০০টাকার বেশি খরচা করতে পারে এমন মানুষ মাত্র ০.২ ভাগ। দেশের ৫০ ভাগ জনসংখ্যা মাসিক খরচা করতে পারে গড়ে মাত্র ২৬২১ টাকা, তার পরের ৪০ ভাগ মাসে খরচা করতে পারে গড়ে মাত্র ৫১০৫ টাকা, সবচেয়ে উপরের দশ ভাগ মানুষ খরচা করতে পারে ১১৮১৫ টাকা। আর সবচেয়ে উপরের ১ ভাগ খরচা করতে পারে মাসে ২৫০৫৭ টাকা। যারা মাসে পাঁচ অঙ্কের রোজগার করেন তাঁরা সমাজের ০.১ থেকে ০.২ ভাগ।

২০২২-২৩ এর সমীক্ষা আরও কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেছে। যেমন জনসংখ্যার ৪০ ভাগ এখনো শুকনো কাঠ বা কয়লা - গোবরের ঘুটেকে রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। ১৮ ভাগ বাড়িতে এখনো টয়েলেট পৌছয় নি, এবং প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার চাল-গম গ্রামে মাত্র ৫০ ভাগ মানুষই পাচ্ছেন, যদিও পাবার কথা ৭৫ ভাগ মানুষের। শহরে মাত্র ২৯ ভাগ মানুষ এই উপকার পাচ্ছেন, যদিও পাবার কথা ৫০ ভাগ মানুষের। শেষের তথ্যটি নমুনা চয়নে যে পক্ষপাত হয়েছে তার জন্যও হতে পারে।

নমুনা চয়নের বিশেষত্বের জন্য আয়ের অসাম্যের আঙ্কিক হিসাবও প্রভাবিত হয়েছে। যেমন উপরের সারণি থেকে যদি প্রথম decile আর ১০ নম্বর decile-এর ফারাক ধরা হয় তাহলে দেখছি অসাম্য গ্রামে ৫.৯ গুণ থেকে কমে ৫.৪ গুণ হয়েছে, শহরে তো ৯.৭ গুণ থেকে কমে ৮.২ গুণ হয়েছে। সরকার কি এমন করল যে অসাম্য এতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কমে গেল, সবাই এই প্রশ্ন করছেন। গল্পের গরু কি এবার রাশি বিজ্ঞানেও চড়ে বসেছে ?

লেখক ব্যাঙ্গালুরু'র আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্টাল স্টাডিস বিভাগের অধ্যাপক।

ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একাধিক অসুখে ভুগছে

মজিবুর রহমান

সাম্প্রতিক নিট (NEET-ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট) কেলেঙ্কারি ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছে। নিট - ইউজি (আন্ডার গ্রাজ্যুয়েট) পরীক্ষার দুর্নীতি প্রকাশ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় নিট - পিজি (পোস্ট গ্রাজ্যুয়েট) পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। স্থগিত করা হয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগের পরীক্ষা ইউজিসি - নেট

(ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন-ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট)। মানবদেহের চিকিৎসা যেভাবে পরিষেবা থেকে পণ্য হয়ে উঠছে তাতে ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। জনস্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে যেভাবে ব্যবসার বৃহৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরবস্থা দূরীকরণে সকলের সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

চিকিৎসকরা হলেন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই চিকিৎসক তৈরি করার পদ্ধতির মধ্যেই গুরুতর গলদ রয়েছে। এই পদ্ধতি যেমন মেধার সাথে আপস করছে তেমনি দুর্নীতির প্লাবন দ্বার খুলে দিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞানের সিলেবাস ও নিট-এর সিলেবাসের মধ্যে বেশ কিছুটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আর, এই দুটো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন অনেকটাই আলাদা।এজন্য নিট-এর প্রস্তুতির সঙ্গে স্কুলের পঠনপাঠনের খুব একটা সম্পর্ক নেই। যারা চিকিৎসক হওয়ার পরিকল্পনা করে তারা উচ্চমাধ্যমিকের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। এজন্য তারা থিয়োরির ক্লাস নয়, শুধুমাত্র প্র্যাকটিক্যাল ও প্রজেক্টের জন্য স্কুল যাওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। অর্থাৎ চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীদের কাছে স্কুলের তেমন গুরুত্ব থাকে না। মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বিদ্যালয়বিমুখতাকে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নেতিবাচক দিক হিসেবেই দেখা দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে অস্বীকার করে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে না। নিট ও উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার পাঠক্রমের মধ্যে প্রভেদ না রেখে নিটের সিলেবাসে কিছু বাড়তি অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এতে মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষার্থীদের পক্ষে দুটি পরীক্ষাতেই ভালো ফল করার সম্ভাবনা বাড়বে। এখন যে পড়ুয়া উচ্চমাধ্যমিকে জোর দেয় সে নিটে ভালো করে না আর যে নিটে জোর দেয় সে উচ্চমাধ্যমিকে ভালো করে না। একজন পড়ুয়ার খুব কাছাকাছি সময়ে দেওয়া দুটো পরীক্ষায় দুরকম ফল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা সর্বভারতীয় না হয়ে রাজ্য ভিত্তিক হওয়া উচিৎ। ২০১৭ সালে জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট চালু হওয়ার আগে সেটাই ছিল।যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিকেন্দ্রীকরণের বদলে সবকিছু কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা কেন? পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে বলতে পারি, কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী পড়ুয়ারা দু'একজন প্রাইভেট টিউটর অথবা জেলার অভ্যন্তরে কোনো কোচিং সেন্টারের সাথে সংযুক্ত থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (JEE) সফল হয়ে ডাক্তারি পড়েছে। আর, এখন নিটের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ভালো কোচিং সেন্টারের সন্ধানে অনেককেই রাজ্যের বাইরে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে।প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পেয়ে অথবা পড়াশোনার চাপ সহ্য করতে না পেরে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে বসছে। কয়েক বারের চেষ্টায় অসফল হয়ে অনেকের ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে অন্ধকার নেমে আসছে। তারা ডাক্তার হতে গিয়ে জীবনযুদ্ধে চিররোগী হয়ে পড়ছে। কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলোর রমরমা ব্যবসায় কোনো ব্যত্যয় ঘটছে না।

মেডিক্যাল কলেজ ও এমবিবিএস (ব্যাচেলর অব মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অব সার্জারি) কোর্সের আসন সংখ্যা প্রায় প্রতি বছরই বৃদ্ধি পায়। সেটাই স্বাভাবিক। এন এম সি (ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশে মেডিক্যাল কলেজ ও এমবিবিএস-এর আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৭০৬ ও ১০৯১৪৫। এর মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮৬ ও ৩২০ আর তাদের আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫৮৮০ ও ৫৩২৬৫। অর্থাৎ, চিকিৎসক তৈরির সরকারি আয়োজনকে প্রায় ধরে ফেলেছে বেসরকারি উদ্যোগ এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অতিক্রম করে যাবে। ২০২৪ সালে নিট-ইউজি'র পরীক্ষার্থী ছিল ২৩ লক্ষ ৩৩ হাজার। সর্বমোট ৭২০ নম্বরের পরীক্ষায় পাস নম্বর নির্ধারিত হয় ১৩৮। অর্থাৎ, ২০ শতাংশের কম নম্বর পেয়েও একজন পরীক্ষার্থী ডাক্তারি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করছে। এত কম নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও পাস করা যায় না। স্কুল শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এর থেকে অনেক বেশি পার্সেন্টেজ পেতে হয়। অতি সাধারণ বা নিম্ন মেধার পড়ুয়ারা ডাক্তার হলে তো খুব মুশকিল! নেট-ইউজি'র পুরো প্রশ্নপত্রটাই এমসিকিউ (মাল্টিপ্ল চয়েস কোশ্চেন) দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ কিছু লেখার দরকার নেই। চারটি বিকল্প থাকে। সেখান থেকে সঠিকটা চিহ্নিত করতে হয়। এরূপ একমাত্রিক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পড়ুয়াদের জ্ঞান, বোধ, বুদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি ও স্মরণ শক্তি তথা সামগ্রিকভাবে মেধা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় না। মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যে পেশাজীবীদের সঙ্গে সেই চিকিৎসকদের মেধার সাথে কখনও আপস করা

উচিৎ নয়। সত্যিকারের মেধাবী ও পরিশ্রমী পড়ুয়ারাই যাতে ডাক্তার হয় তা নিশ্চিত করা দরকার।এজন্য বর্তমানে মেডিক্যালের যে পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে তা পাল্টানো এবং পাস নম্বর বাড়ানো জরুরি।

এমবিবিএস কোর্স করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ সরকারি কলেজ। এর একটা বড় কারণ সরকারি কলেজে পড়াশোনা করার খরচ বেসরকারি কলেজের তুলনায় অনেকটাই কম। পাঁচ বছরের এমবিবিএস কোর্স সরকারি কলেজে সাকুল্যে ২-৩ লাখ টাকায় হয়ে যায়। এর ফলে মধ্যবিত্ত তো বটেই এমনকি নিম্নবিত্ত পরিবারের পড়ুয়াকেও আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় না।কিন্তু বেসরকারি কলেজে পড়ার খরচ ৭০ লাখের উপরে শুরু হয় এবং তা ১ কোটি থেকে ১.৫ কোটিতে পৌঁছায় যা কেবলমাত্র উচ্চবিত্তদের পক্ষেই অ্যাফোর্ড করা সম্ভব।সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোর্স ফি-এর মধ্যে এমন বিশাল ব্যবধান আমাদের 'সমাজতান্ত্রিক' দেশে কতটা যুক্তিযুক্ত ভেবে দেখা দরকার। বেসরকারি কলেজের ফি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

নিট-ইউজি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে যে মেধা তালিকা তৈরি হয় তার প্রথম দিককার স্থানাধিকারীরা সরকারি কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়।কে কোন কলেজে ভর্তি হতে পারবে সেটাও নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেয়। ২০২৪ সালে ২৩ লাখ ৩৩ হাজার পরীক্ষার্থী ছিল। উত্তীর্ণ হয়েছে ১৩ লক্ষ। প্রথমদিককার ৫৬ হাজার প্রার্থী সরকারি কলেজে ভর্তি হবে। বাকি ৫৩ হাজার আসনে বেসরকারি কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে।বেসরকারি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা তালিকার ক্রমিক নম্বরের কোনো গুরুত্ব নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেসরকারিতে ৫৫০ নম্বর পাওয়া পড়ুয়ার যতটুকু অধিকার ১৫০ নম্বর পাওয়া প্রার্থীরও ততটুকু অধিকার। মেধার কোনো মূল্য নেই। আসলে এখানে পুরোটাই টাকার খেলা। যার টাকা আছে সে ন্যূনতম কোয়ালিফাইং নম্বর পেয়েই ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে আর, যার টাকা নেই সে দুই-চার নম্বর কম পাওয়ার কারণে সরকারি কলেজে ভর্তি হতে পারেনি বলেই তার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন কখনও পূরণ হবে না।নিটে ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া দরিদ্র পরিবারের ছেলেটি বা মেয়েটি ডাক্তার হতে পারবে না কিন্তু ২০ শতাংশ নম্বর পাওয়া ধনী পিতামাতার সন্তানের গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলবে।এই ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবেই ভালো মানের চিকিৎসক তৈরির পরিপন্থী।

ভারতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করার অত্যধিক খরচের জন্য প্রতি বছর লক্ষাধিক নেট উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশ, ইউক্রেন, চীন প্রভৃতি দেশে পাড়ি দেয়। বাংলাদেশে ৩০-৪০ লাখে ও ইউক্রেনে ২০-২৫ লাখে ডাক্তারি পড়া যায়। চীনে আরও কম টাকায় ডাক্তারি পড়ানো হয়। তাহলে ভারতে প্রাইভেট কলেজে এমবিবিএস কোর্সে কোটি টাকার গল্প কেন? আসলে আমাদের দেশের সরকার স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি আর কোটিপতি বাবামায়ের সন্তানের চিকিৎসক হওয়ার পথ প্রশস্ত করতেই নিটের নিয়মাবলি রচনা করেছে।

নিট পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির পেছনেও একটি বড় কারণ প্রাইভেট কলেজের ফি। যাদের ৮০-১০০% নম্বর পাওয়ার মতো মেধা নেই বা বলা যায় যাদের সরকারি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদের একাংশ প্রশ্নপত্র কেনার চেষ্টা করে। ৩০-৪০ লাখ টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনে ভালো ফল করে সরকারি কলেজে ভর্তি হতে পারলে বেসরকারি কলেজে পড়ার খরচ ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। দুর্নীতির মধ্যেও অঙ্ক রয়েছে! সুতরাং, দুর্নীতি বন্ধ করার একটা উপায় হিসেবেও প্রাইভেট কলেজের ফি কমানো দরকার।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর টাকা খরচ করে যারা ডাক্তার হয় তাদের অনেকেই চেষ্টা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই টাকা তুলে নেওয়া যায়। ডাক্তার হয়ে 'মানবসেবা'র কথা বিস্মৃত হয়ে তারা অর্থ উপার্জনে মনোনিবেশ করে। সরকারি বেতনে তাদের পোষায় না। তারা সরকারি চাকরির পরওয়া করে না। সরকারি চাকরি পেলে ভালো, না পেলেও ক্ষতি নেই। প্রাইভেট চেম্বার ও প্রাইভেট হাসপাতাল তথা নার্সিংহোমই যথেষ্ট।যত রকম ভাবে সম্ভব পেশেন্ট পার্টির পকেট কাটার ব্যবস্থা করা হবে। প্রথমত, চার-পাঁচ মিনিটে রোগী দেখে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে চার-পাঁচশো টাকা 'ভিজিট' নেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন না থাকলেও প্রেসক্রিপশনে এক বা একাধিক টেস্ট লিখে ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে 'কমিশন' খেতে হবে। টেস্ট যত দামী হবে কমিশন তত বেশি হবে। তৃতীয়ত, ওষুধ ব্যবসায়ীদের এজেন্ট তথা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কথা মতো কাজ করে 'গিফট' নিতে হবে। এভাবেই অনৈতিক উপায়ে দৈনিক হাজার হাজার অথবা লক্ষাধিক টাকা উপার্জন নিশ্চিত করা হবে।

টাকার জোরে বেসরকারি কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে যখন অনেকেই এত উপার্জন করে তখন যারা মেধার জোরে সরকারি কলেজ থেকে ডাক্তার হয়েছে তারা প্রথমজনদের থেকে কম উপার্জনকে মেনে নিতে পারে না। তখন তারাও প্রথমজনদের পথ অবলম্বন করে। দুটি ক্ষেত্রেই কিছু ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সাধারণ প্রবণতা হল আজকাল অর্থের জন্য চিকিৎসকদের 'ভগবান' থেকে 'কসাই' হতে আপত্তি নেই। চিকিৎসকদের এই অসুস্থ মানসিকতা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক।

ওষুধ ব্যবসা সাংঘাতিক মুনাফার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসকদের একাংশের যোগসাজশে অত্যন্ত চড়া দামে বাজারে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, হার্ট অ্যাটাকে ব্যবহৃত স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ইনজেকশন পেশেন্ট পার্টিকে কিনতে হয় ৯ হাজার টাকা দিয়ে, অথচ ইনজেকশনটির প্রকৃত মূল্য ৭০০-৯০০ টাকা। টাইফয়েডে ব্যবহৃত মনোসেফ ট্যাবলেটের পাইকারি মূল্য ২৫ টাকা, কিন্তু ফার্মেসি থেকে দ্বিগুণ অর্থ দিয়ে কিনতে হয়। ডায়ালাইসিসের একটি ৫০০ টাকার ইনজেকশন পেশেন্ট পার্টিকে কিনতে হয় ১৮০০ টাকা দিয়ে। সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ১৫০ টাকার অ্যান্টিবায়োটিকের বদলে ডাক্তার হয়তো প্রেসক্রাইব করছেন ৫৪০ টাকা মূল্যের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক। বাজারে একটি আল্ট্রাসাউন্ড টেস্ট করলে দিতে হয় ৭৫০ টাকা, রেডিওলজিস্ট পায় ২৪০ টাকা, বাকিটা ডাক্তারের কমিশন। এম আর আই করতে ডাক্তারের কমিশন ২০০০ থেকে ৩০০০ টাকা।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল বদল দরকার। কিন্তু বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের যুগে তার খুব একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সরকার শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে ক্রমাগত হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ যত কমবে অনিয়ম, দুর্নীতি ও শোষণ তত বাড়বে। মূল্যবোধ ও মানবিকতার অবক্ষয় আরও ত্বরান্বিত হবে। জনসচেতনতা ও গণপ্রতিরোধ ছাড়া অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

লেখক প্রধানশিক্ষক, কাবিলপুর হাইস্কুল, মুর্শিদাবাদ জেলা।

ভারতের ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অনৈতিক কাজ

সৌর বসু

এটা খুবই সত্যি যে, ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলিতে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে খুব কম সম্প্রদায়িক সংঘাত ছিল। ভারত থেকে শুরু করে আরব হয়ে তুরস্ক এবং আফ্রিকা ও স্পেনের অধীনস্ত রাজ্যগুলি পর্যন্ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদিদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল এবং জার্মানিতে ইহুদিদের যেভাবে গণহত্যা করা হয়েছিল মুসলিম সাম্রাজ্যে তা অজানা ছিল। অনেক ইহুদি মুসলিম আদালতে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহুদী মুসলিম বিদ্বেষ অতি সাম্প্রতিক ঘটনা।

ইহুদি এবং ফিলিস্তিনিদের নিজেদের একটি করে রাষ্ট্র প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি এটাও সত্য যে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ফিলিস্তিনিদের উপর আক্রমণ হয়ে চলেছে। গাজা ভূখণ্ড থেকে ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলের ইহুদিরা বহিষ্কৃত করার চেষ্টা করছে। এর পিছনে পশ্চিমে দেশগুলি সমর্থন রয়েছে। পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের পিছনে একটি বর্ণবাদী কারণ রয়েছে। মজার কথা এই যে ইহুদিরা আর্য না হওয়ার কারণে নাৎসিদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল। এখনো কিছু নব-নৎসি আছে যারা ইহুদি বিরোধী এবং ইসলামবিদ্বেষী। ইজরায়েল গাজাতে নিয়মিত বোমাবর্ষণ করে শিশু মহিলা সহ বহু মানুষকে নির্মম ভাবে হত্যা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে যাই বলুক না কেন, তারা ইসরায়েলকে এই গণহত্যার জন্য নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। কলম্বিয়ার বামপন্থী রাষ্ট্রপতি পুস্তক ও পেট্রো একবার বলেছিলেন যে ইজরায়েল ফিলিস্তানিদের সঙ্গে যা করছে নাৎসি রাও জার্মানিতে ইহুদিদের সঙ্গে সেই একই কাজ করেছে। একথা বলার জন্য অবশ্য ইসরায়েল কলাম্বিয়াতে রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

বিগত কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। একটা রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্রকে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু যখন সেই অস্ত্র নিরাপরাধ শিশুদের উপর মহিলাদের উপর প্রয়োগ করে গণহত্যা করা হয়, তখন রাষ্ট্র তার দায় এড়াতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা দেশগুলির সাদা চামড়াদের মধ্যে একটা বর্ণবাদী উপাদান

থেকেই গেছে।

হামাস একটি উগ্র ইসলামিক সংগঠন। ইসরায়েলে তাদের আক্রমণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। হামাসের এই নৃশংস আক্রমণ পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলি সমর্থন করে না।। ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি দুটি রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে দিয়ে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনিদের সমস্যার সমাধানের কথা বিশ্বাস করত তাহলে পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলোর সমর্থন তারা পেতো। কারণ হামাসের ইসলামিক কার্য পদ্ধতির প্রতি তাদের সমর্থন নেই এবং ইসরায়েলে যে নিরীহ মানুষেরা, হামাসের নৃশংস আক্রমণে বলি হয়েছে, তাদের প্রতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি সহানুভূতিশীল।

প্যালেস্টাইন এবং গাজা অঞ্চলে যে ঘটনা ঘটে চলেছে পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ সেজন্য শঙ্কিত। জাতিসংঘের নিষেধের তোয়াক্কা না করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা স্ট্রিপে শিশু, মহিলা এবং নিরাপরাধ ব্যক্তিদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে তাদের হত্যা করে চলেছে। হাসপাতাল স্কুল, সাধারণ মানুষের বাসস্থান সব কিছুই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাস কর্তৃক আক্রমণের পর ইসরায়েলি সৈন্যরা প্যালেস্টাইন এবং গাজা ভূখণ্ডের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ফলে প্রায় ২ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় এবং ৩৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু এবং মহিলা।

১৮০টিরও বেশি জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই স্কুলগুলিতে হাজার হাজার শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছিল। ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের আরবদের বিবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়।

জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী প্যালেস্টাইনকে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার কথা বলা হয়। একটি রাষ্ট্র হবে আরবদের এবং অপর একটি রাষ্ট্র ইহুদিদের। কিন্তু প্যালেস্টাইন থেকে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ উঠে যাবার পরেই ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আরব ইসরায়েলের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত এখান থেকেই। ১৯৪৮ থেকে ২০২৪ সাল অব্দি বিভিন্ন সময়ে আরব এবং ইসরায়েলে বসবাসকারী ইহুদিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বস্তুতপক্ষে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের অনেক অংশ দখল করে নিয়েছে। ইসরায়েলিরা প্যালেস্টাইন এবং গাজা ভূখণ্ড তাদের দখলে নিয়ে আসতে চায়। সেজন্য প্যালেস্টাইন এবং গাজায় অবস্থিত আরবদের উপরে আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে আসছে। ইজরায়েলের মূল প্রেরণা দাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলি ।

ইসরায়েল কর্তৃক এই গণহত্যার ছবি বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে উপচে পড়ছে। এই ছবিগুলি ইসরায়েলের মানবতা বিরোধী অপরাধের জ্বলন্ত প্রমাণ। মায়ের কোলে মৃত শিশু অথবা বিধ্বংসী বোমার ধ্বংসাবশেষ থেকে মৃত সন্তানকে বার করে এনে পিতার অশ্রুসিক্ত ছবি সমাজ মাধ্যমে নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্প্রতি মোঃ সালেম, একজন প্যালেসটিনিয়ান ফটোগ্রাফার একটি হৃদয়বিদারক ছবি ২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড ফটো অফ দা ইয়ার সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ছবিটি হামাসের, ইসরাইল আক্রমণের পর গাজায় যে বিধ্বংসী হত্যাকাণ্ড ইসরায়েল চালাচ্ছে তারই একটি মুহূর্ত। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে মর্গের সামনে ইনাস তার পাঁচ বছরের ভাগ্নির মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে একটি ক্ষেপণাস্ত্র হানায় শিশুটি তার মা ও বাবার সঙ্গে নিহত হন।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে যে ভারত থেকে অস্ত্র ইসরায়েলে এসে পৌঁছাচ্ছে। আমাদের দেশ যখন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় ভারতের বন্দর থেকে Borkum নামক একটি জাহাজ স্পেনের Cartagena বন্দরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। বন্দরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তখন ফিলিস্তিনিরা পতাকা হাতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। Borkum জাহাজটির অভিমুখ ইসরাইল। জাহাজটিতে সমরাস্ত্র রয়েছে বলে প্রতিবাদী ফিলিস্তিনিদের ধারণা। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বামপন্থী সদস্যরা স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান কে জাহাজটিকে স্পেনের বন্দরে ঢুকতে না দেওয়ার আর্জি জানায়। জাহাজটি বন্দরে প্রবেশ করার পূর্বেই তার অভিমুখ পরিবর্তন করে। আল জাজিরা সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে যে জাহাজটি ভারতের চেন্নাই থেকে রকেট ইঞ্জিন, রকেট এবং অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে গাজা ভূখণ্ডের নিকটবর্তী Ashdod অভিমুখে, চেন্নাই থেকে এপ্রিল মাসে রওনা দিয়েছে।

হামাস গোষ্ঠী ইসরায়েলে বোমাবর্ষণ এবং নৃশংস আক্রমণের পরেই নরেন্দ্র মোদি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। হামাস কর্তৃক ইজরায়েলের উপর এই আক্রমণের সময় নরেন্দ্র মোদী ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সন্ত্রাসী হানা সম্পর্কে ভারতকে সাবধান করে

দিয়েছে। ভারত যদি এখন থেকে সচেতন না হয় তাহলে ভারতকেও এই ধরনের পরিস্থিতি মুখোমুখি হতে হবে বলে তিনি সতর্কীকরণে বলেন। স্পষ্টতই মোদির আমলে ভারত তার অতীতের আরব ইসরায়েলের সম্পর্কিত অবস্থানসূত্র থেকে দূরে সরে গেছে।

আরব ইসরায়েল যুদ্ধের সমাধান সম্পর্কিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবে কঠোর হিন্দু জাতীয়তাবাদী মোদি সরকার স্বাক্ষর করে নি। ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত ইসরায়েলকে সমর্থনের জন্য দিল্লিতে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে মোদি সরকারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

ইসরায়েলের প্রতি ভারতের এই মনোভাব প্রকাশিত হবার পর হামাস এবং ফিলিস্তিনিওদের নিয়ে মিথ্যা প্রচার, আষাঢ়ে গল্প সমাজ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ইসলামোফোবিয়া নিয়ে বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিল, হামাসের আক্রমণের পর তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ভারতের ইসরাইল সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থানের পরিপন্থী ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং মহাত্মা গান্ধীর অবস্থান ।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের তাঁরা বিরোধী ছিলেন। আজকে প্যালেস্টাইনের যা ঘটছে, মহাত্মা গান্ধী এবং জহরলাল নেহেরু সেটা অনুমান করতে পেরে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।। ভারতবর্ষ প্রথম রাষ্ট্র যে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন কে প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি হিসেবে ৭০ এর দশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৮০ দশকে ভারত পি এল ও কে কূটনৈতিক মর্যাদা প্রদান করে।

১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধের সময় ইসরায়েল ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করে। কারগিল যুদ্ধের পর থেকেই ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। তখন থেকেই ভারত ইসরায়েলের কাছ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র ক্রয় করতে শুরু করে। ভারতে যারা অস্ত্র সরবরাহ করে তাদের মধ্যে রাশিয়ার পরেই ইসরায়েলের স্থান। ২০১৭ সালে মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইসরায়েল সফরে যান। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুও ভারতে আসেন।

ভারত এবং ইসরায়েল দুটো প্রাচীন সভ্যতাই মুসলমানদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, এই অনৈতিহাসিক ভাষ্যটি, বিজেপির আমলে এই দুটি দেশকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। অথচ হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই সত্যকে হিন্দুত্ববাদীরা অস্বীকার করেন ।মুঘল আমলে শাহাজাহান পুত্র দারা শুকো সংস্কৃত থেকে উপনিষদ সর্বপ্রথম পার্শীতে অনুবাদ করেন একথা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা স্মরণে রাখেন না। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকে বিজেপির রাষ্ট্র নেতারা মডেল হিসেবে দেখেন।

সৌদি আরব, ইউ এ ই এবং ওমানের প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত Talmiz Ahmed একটি সাক্ষাৎকারে করণ থাপার কে বলেন ভারত কর্তৃক ইজরায়েলে হামাস আক্রমণের পর অস্ত্র সরবরাহ করা একটি নিন্দনীয় অপরাধ। প্রথমত এই অস্ত্র ইসরায়েল, প্যালেস্টাইনের নিরাপরাধ শিশু এবং মহিলাদের উপর প্রয়োগ করবে।

ইসরায়েল চায় প্যালেস্টাইন কে গুঁড়িয়ে দিতে, গাঁজা ভূখণ্ডকে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে মুক্ত করতে। প্যালেস্টাইন এবং গাজা ভূখণ্ডের উপর ইসরায়েলের এই আক্রমণকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অপরাধমূলক বলে বর্ণনা করেছে। ভারতের ইজরায়েলকে অস্ত্র বিক্রি করা একটি অনৈতিক কাজ বলে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত তালমিজ আহমেদ মনে করেন।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধেও মানবতার পক্ষে রায়

খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

গত দুই দশক ধরে গোটা বিশ্বজুড়েই অতি দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান হচ্ছিল ।কোনও কোনও দেশে এই দক্ষিণপন্থী শক্তি চরম সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিগত কয়েক বছর ধরে যে দুশ্চিন্তা ও চরম উদ্বেগ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই উদ্বেগ আলশঙ্কা যেনো কাটতে শুরু করেছে।

আমাদের দেশেও উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমাগত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের আদর্শকে পদদলিত করে চলেছে। হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদী শক্তি অশোক- আকবর- দারাশুকো- বিবেকানন্দ- রবীন্দ্রনাথ- মহাত্মা গান্ধীর দেশে অহিন্দুদের উপরে, বিশেষ করে মুসলিম

ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভাইবোনদের সঙ্গে যে অমানবিক আচরণ করে চলেছে , তা আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী ঐতিহ্যের লজ্জা। আবার এই ভারতেই কাশ্মীরের মাটিতে মুসলিম মৌলবাদীরা সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে, কিংবা পাকিস্থান, সৌদি আরব, ইত্যাদি দেশে সুন্নি ধর্মীয় মৌলবাদের ধ্বজা তুলে যে মানব অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এবং হচ্ছে, তা মিশরের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা গামাল আব্দেল নাসের, কিংবা প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক ইয়াসের আরফত, কিংবা তুরস্কের জননেতা মুস্তাফা কামাল পাশা ও বরেণ্য কবি নাজিম হিকমৎ, কিংবা আমাদের এই উপমহাদেশের গৌরব, সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফর খানের সু-উন্নত সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান। আবার, ইরাণে শিয়া মৌলবাদের ধ্বজা তুলে অ-শিয়া মুসলিমদের উপরে, কিংবা মায়ানমারে বৌদ্ধ মৌলবাদীরা মুসলিম হবার অপরাধে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের উপরে যে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তাকে ধিক্কারের ভাষা নেই। উত্তর পূর্ব্ব ভারতে মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চলে উগ্র ক্যাথলিক আধিপত্যবাদ ও উগ্র হিন্দু-মৌলবাদের দ্বন্দ্ব শান্ত সবুজ পাহাড়গুলিকে অশান্ত ও রক্তাক্ত করে তুলেছে।

এর উপরে আছে ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার লাগামহীন শোষণ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি ও অপুষ্টি ও অনুন্নয়নের দাপট। বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবি মানুষ আজ দিশেহারা। শিল্প বিপ্লবের আঁতুড়ঘর ইউরোপে আজ শিল্প সংকট। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্য সংকটে আজ আর নতুন শিল্প স্থাপন তো হচ্ছেই না। বরং দিন দিন কারখানার পর কারখানা বন্ধ হচ্ছে শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে, কর্মহীন হয়ে যাচ্ছে অগণিত শ্রমজীবি মানুষ। শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের পীঠস্থান ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কবরের শূন্যতা, শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

সর্ব্বোপরি, এই জটিল বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে সারা পৃথিবীর সুস্থ চিন্তার সকল মানুষের মত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জনগণ প্যালেস্টাইন প্রশ্নে, জর্ডানের দু-তীরে, গাজার প্রান্তরে নারী শিশু নির্বিশেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইহুদি মৌলবাদের ধারক ও বাহক ইসরায়েলী প্রশাসন কর্তৃক মুসলিম হবার অপরাধে প্যালেস্টাইনবাসীকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার বর্বরতা মোটেও ভালো চোখে দেখেনি। তাঁরা লণ্ডন, প্যারিস, ল্যাঙ্কাশায়ারের রাজপথ প্রতিবাদে মুখর করে তুলেছেন। তাঁরা দাবী তুলেছেন তাঁদের দেশের সরকারগুলি প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করুক এবং মার্কিন ইসরায়েল বর্বরতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করুক।

কিন্তু, সাম্প্রতিক নির্বাচনের আগে ব্রিটেন ও ফ্রান্সে যাঁরা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা দুইটি জিনিষ করেছেন একইভাবে (১) ঠিক যেভাবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা পাকিস্থানকে সমর্থন করেছিল, ঠিক একইভাবে, প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামে প্যালেস্টাইন জনতার বিরুদ্ধে মার্কিন মদতপুষ্ট ইসরাইলী হিংস্রতাকে সমর্থন করে গেছেন। (২) ধনবাদী অর্থনীতির পথে চলতে গিয়ে দেশের জনগণের দুর্ভোগকে বাড়িয়েছেন চূড়ান্তভাবে। তাই এই দুই অমানবিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন ব্রিটেনবাসী ও ফ্রান্সবাসী এই নির্বাচনী রায়ের ভিতর দিয়ে। একে অভিনন্দন। এত দিন পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্সে চরম দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় ছিলেন। কি ধর্মীয় প্রশ্নে, কি অর্থনীতির প্রশ্নে, কি মানবিকতার প্রশ্নে, কোনও রকম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের ছিল না। ব্রিটিশ ও ফরাসী সংস্কৃতির যে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক অর্থাৎ দশম চার্লস, চতুর্দশ লুই প্রমুখ স্বৈরতন্ত্রীদের সংস্কৃতির দিক, বেন্থাম, জেমস্ মিল, জনস্টুয়ার্ট মিল, এ্যাডাম স্মীথ প্রমুখ অবাধ বাণিজ্যবাদীদের যে অর্থনৈতিক দর্শনের দিক, তার দ্বারা তাঁরা ছিলেন পরিচালিত। স্বভাবতঃই প্যালেস্টাইন মুক্তি যুদ্ধে মার্কিন--ইসরাইলী বর্বরতাকে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পথে ব্রিটিশ ও ফরাসী জণগণের দুর্ভোগকে তাঁরা সমর্থনই করে গেছেন। প্যালেস্টাইন জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে তারা সমর্থন করেননি--বিরোধীতা করে গেছেন। ফরাসী ও ব্রিটিশ জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য তাঁরা কোনও জনকল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করেননি। তাই এই দুই দেশের সচেতন ও মানবতাবাদী জনগণ মানবতার পক্ষেই, রায় দিয়েছেন। তাঁরা রায় দিয়েছেন প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করবে, এমন একটি সরকার গঠনের পক্ষে, তাঁরা রায় দিয়েছেন ধনতান্ত্রিক শোষণের যন্ত্রণা থেকে তাঁদের একটু স্বস্তি দেবে, এমন একটি সরকার গঠনের লক্ষ্যে।

উল্লেখ্য যে ব্রিটেন বা ফ্রান্স হোল সেই দেশ যেখানে দশম চার্লস বা চতুর্দশ লুই-এর মতো অত্যাচারীরা যেমন জন্মেছেন, কিংবা বেন্থাম, মিল, এ্যাডাম স্মীথের মত ধনতন্ত্রের উগ্র প্রবক্তারা যেমন জন্মেছেন, তেমনি রুশো, ভল্টেয়ার, মন্তেস্কু, জন লক, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, টমাস হিল গ্রীন, আওয়েন, প্রমুখের মত গণতন্ত্রবাদী তথা জনকল্যাণ মূলক চিন্তাবিদরাও

জন্মেছেন। কাজেই, এঁদের ঐতিহ্যগত প্রভাব ব্রিটিশ ও ফরাসী জনগণের মনন ও চিন্তার উপর কাজ করেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এবারে ব্যালট বাক্সে ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে।

একথা ঠিক যে ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থী দল কনজারভেটিভদের পরাজয় এবং লেবার পার্টির সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক হলেও, আনন্দে আত্মহারা হবার কোনও অবকাশ নেই। কারণ, নির্বাচনে হেরে গেলেও কনজারভেটিভরা হারিয়ে যায়নি। বিশ্ব প্রতিক্রিয়ার স্রোতের সাথে, অর্থাৎ বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী তথা পুঁজিবাদের জালের সঙ্গে এদের সংশ্রব আছে। একই কথা ফ্রান্স সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সেখানে, দক্ষিণপন্থীদের জোট পরাস্ত হলেও, এবং বামপন্থীদের জোট জয়ী হলেও, সে দেশেও নির্বাচনী যুদ্ধে পরাস্ত দক্ষিণপন্থীরা এখনও খুবই বলীয়ান। তাদের প্রত্যাঘাতের ক্ষমতা প্রচুর। এইসব বিষয়ে উভয় দেশের জনগণকে সচেতন থাকতে হবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে বলা চলে যে একটি দেশের রাজনীতির দুইটি দিক থাকে। একটি হল অভ্যন্তরীণ দিক, অন্যটি হোল তার বৈদেশিক দিক। বিশ্বজুড়ে আজ দেশে দেশে মানুষ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সরকারের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা, ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধীতা ও ধর্ম বৈষম্যবাদ বিরোধীতা কেন্দ্রিক ভূমিকাকে দেখতে চায়।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তারা চায় ধনতান্ত্রিক শোষণের ও নিপীড়নের অবসান ও একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার শুভ বোধন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নির্বাচনী ফলাফলে জনগণের এই মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে। এতে শুধু স্বাধীনতাকামী প্যালেস্টাইনবাসীই নন, জাতিধর্ম দেশ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী তথা মানবপ্রেমী মানুষরা খুবই উৎসাহিত। সেই সঙ্গে উৎসাহিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা একটি অধনবাদী, জনকল্যাণবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো চান তাঁরাও। আজ থেকে পৌনে ২০০ বছর আগে, ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন "A Spectre is haunting Europe– the Spectre of Communism"- অর্থাৎ সারা ইউরোপ আজ ভূত দেখছে, সাম্যবাদের ভূত। আর আজ আমরা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নির্বাচনের ফলাফলের নিরীখে বলতে পারি, "A Spectre is haunting Europe– the Spectre of Secularism-cum-leftism"-অর্থাৎ সারা ইউরোপ আজ ভূত দেখছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বামপন্থার ভূত। প্রগতির এক বিশ্বজোড়া নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে উল্লিখিত নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়ে। এই সম্ভাবনা প্যালেস্টাইনসহ সারা পৃথিবীর যেখানে যেখানে জনগণ স্বাধীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য তথা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য লড়ছেন, তাঁদেরকে অবশ্যই নব প্রেরণার খোরাক যোগাবে এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর পথে নব দিগন্তের উন্মোচন করবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক কলকাতার সাউথ সিটি (দিবা) কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

২০২৪ ক্ষমতায় এনডিএ; হিন্দু জাতীয়তাবাদ কোথায়?

রাম পুনিয়ানি

বিজেপি একা ২৭২ পার করতে না পারায় এনডিএ আবার সামনে চলে এসেছে। ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ি যখন এনডিএ সরকারের নেতৃত্ব দিয়ে মসনদে বসেছিলেন, তখন সেই সরকারেও কিন্তু বিজেপির রাজনীতির একটা গভীর ছাপ ছিল। আরও অনেক বিষয়ের সঙ্গে আমরা সেই সময়ের হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডার দুটি প্রয়োগের কথা নিশ্চিতভাবে স্মরণ করতে পারি; সংবিধান পর্যালোচনার জন্য বেঙ্কটচালিয়া কমিশনের নিয়োগ এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির গেরুয়াকরণ, জ্যোতিষ এবং পৌরোহিত্য-কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা। ২০১৪ এবং ২০১৯, এই দুবার মোদি এনডিএ সরকার হিসেবে ক্ষমতায় এলেও বিজেপির এতটাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল যে অন্য শরিকদের 'সাইলেন্ট মোড'-এ রেখে বিজেপি আগ্রাসীভাবে তাদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির রূপায়ণ চালিয়ে গেছে। রামমন্দির বানিয়েছে, ৩৭০ ধারা বিলোপ করেছে। এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে গরুর মাংস বা লাভ-জিহাদের মতো বিষয়গুলি তুলে মুসলিমদের অবাধে হত্যা করা হয়েছে। এসব ঘৃণ্য কাজ যারা করেছে তারা জানত রাষ্ট্র তাদের কিছু বলবে না।

মোদি সরকারের অন্যান্য স্বৈরাচারী কাজগুলির অন্যতম হল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা এবং মিডিয়াকে গোদি মিডিয়ায় পরিণত করা। এই সমস্ত বিষয়গুলিই বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটে ঐক্যবদ্ধ হতে

সাহায্য করেছে। আর সেই বিরোধী জোটের জন্যই বিজেপির এবং স্বয়ং মোদির নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে চরম মুসলিম-বিদ্বেষী প্রোপাগান্ডায়। কংগ্রেসের ইস্তেহারকে বলা হয়েছে প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম লিগের ইস্তেহার। তাদের স্লোগান এবং প্রতিশ্রুতিগুলিকে বলা হয়েছে সবই আসলে মুসলিম-তোষণের কথাবার্তা। মুসলিমদের বলা হয়েছে ঘুষপেটিয়া এবং তারা গাদা গাদা বাচ্চা পয়দা করে। মোদির প্রচার কুরুচির শেষ সীমায় পৌঁছে যায় যখন তিনি বলেন কংগ্রেস মুসলিমদের জন্য মুজরো করবে। এ-ও বলা হয়েছে, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি দিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ানো হবে, দেশে তালিবান আইন প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনভাবে সিস্টেম করা হয়েছে যে মুসলিমদের অনেকেই ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম খুঁজে পাননি, অনেককেই পুলিশ ভোটবুথ থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। বাস্তবতই মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, করে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিকভাবে অদৃশ্য। এবং এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েই এই অসহায় সম্প্রদায়ের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণের ঘৃণা তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি যখন তাদের বহুল প্রচারিত আসন সংখ্যার ঘোষণার (এনডিএ; ৪০০+, বিজেপি একাই ৩৭০+) ধারেকাছেও যেতে পারল না, তখন মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির একটা বিরাট শ্বাস ফেলেছেন। ফল প্রকাশের পর মোদি যখন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, দেখা গেল তাঁর গলা অনেক খাদে নেমে এসেছে এবং তিনি 'সর্ব ধর্ম সম্ভব' (সব ধর্মকে সম্মান দেওয়া) - র কথা বলছেন। গত দশ বছরে দেশে মুসলিমদের (এবং খ্রিস্টানদেরও) সঙ্গে যা হয়েছে, তা মনে রাখলে একে হিপোক্রিসির চূড়ান্ত বলে মনে হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

সামনের দিনগুলিতে এই সম্প্রদায়ের বরাতে কী আছে? কিছুটা স্বস্তি হয়তো তাদের মিলবে, কারণ হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডাবাহিনি এতদিন যে আজাদি উপভোগ করে এসেছে তা হয়তো কিছু কমবে। যদিও এখানে একটা বড়সড় 'যদি' আছে। কারণ এই গুণ্ডাবাহিনি এবং তাদের মানসিকতার শিকড় এতদিনে সিস্টেমের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে। নীতীশ এবং নাইডুর মতো সহযোগীরা মুসলিম-বিরোধী হিংসার বিরুদ্ধে কতটা সোচ্চার হবেন তা-ও এখনও দেখা হয়নি। মোদির পার্টির আগ্রাসী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁরা কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন সে উত্তরও ভবিষ্যৎই দেবে। মনে রাখতে হবে, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা এতদিন ধরে যে লাগামছাড়া ঘৃণার চাষ করেছে তা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে এবং তাকে কমানো খুব একটা সহজ হবে না।

আপাতত যেটা বলা যায়, হিন্দুত্বের তৃতীয় স্তম্ভ; অভিন্ন দেওয়ানি বিধি; সেটা বেশ কিছুদিনের জন্য বিলম্বিত হল। সিএএ-র মতো মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিভাজনমূলক আইন ইতিমধ্যেই ঝুলন্ত তরবারি হয়ে রয়েছে। সময়ই একমাত্র বলতে পারে এই আইন কার্যকর করার জন্য বিজেপি কতটা শক্তি ব্যয় করবে। শাহিনবাগের দুর্ধর্ষ আন্দোলনের পর এটা নিশ্চিত যে সাম্প্রদায়িক বিজেপি যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছে যে নাইডু-নীতীশরা থাকা সত্ত্বেও তারা এই আইন কার্যকর করতে সক্ষম হবে ততক্ষণ তারা এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। মনে রাখতে হবে চন্দ্রবাবু নাইডু বা নীতীশ কুমার কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট কৌশলী। চন্দ্রবাবু ইতিমধ্যেই নিজের রাজ্যে মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করতেও উদ্যোগী হয়েছেন।

আরেকটা বড় ইস্যু হল জাতগণনা। বিজেপি এতদিন এর বিরোধিতা করে এসেছে। কিন্তু এখন তাদের সঙ্গী নীতীশ কুমার, যিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিহারে জাতগণনা করিয়েছেন এবং সে-রাজ্যে এই বিষয়ে একটা ব্যাপক গণদাবি তৈরি হয়েছে। মোদি যে প্রচার চালিয়েছিলেন যে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে এসসি-এসটিদের সংরক্ষণ বাতিল করে সব মুসলিমদের দিয়ে দেবে সে-প্রচার সে-রাজ্যে কেউ বিশ্বাস করেনি। সব মিলিয়ে জাতগণনা নিয়েও নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে।

মুসলিমদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কী আশা করতে পারি? সঙ্ঘ পরিবার এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে বিপুল পরিমাণ ঘৃণা ছড়িয়েছে তা আমাদের সমাজের চিন্তাজগতে অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। মুসলিম-বিরোধী চিন্তাভাবনা আজ সমাজের গড়পড়তা ধ্যানধারণার অঙ্গ হয়ে গেছে। একদিকে সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনগুলির এই ঘৃণ্য প্রচার, তার সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন, সাংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং মুখে মুখে নানা ভুল ধারণার প্রচারের ফলে এই বিষয়টি গুণিতক হারে বেড়ে উঠেছে। এই মিথ এবং ভুল ধারণাগুলিই সেই ভিত্তির কাজ করেছে যার ওপর ঘৃণার চাষ করা সহজ হয়েছে। এতে

সহযোগিতা করেছে সমাজে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিরূপ ধারণা। এবং এগুলির ফলশ্রুতিই হল হিংসা এবং মেরুকরণ। ২০২৪-এর নির্বাচনে আরএসএস-এর ভূমিকার গভীর বিশ্লেষণ এখনও হয়নি, কিন্তু এটা নিয়ে সন্দেহ নেই যে এই আরএসএস-ই মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং গত দুই দশক ধরে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও ঘৃণার চাষ করে আসছে। মনে রাখতে হবে মোদি-জমানার দশ বছরে গোটা দেশ জুড়ে আরএসএসের শাখাগুলির সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সন্দেহ করা অমূলক নয় যে, ওড়িশার মতো রাজ্যে যেখানে কন্ধমাল দাঙ্গা হয়েছিল, গ্রাহাম স্টেইনসকে সপরিবারে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল; সেই ঘটনাগুলিই প্রকৃতপক্ষে বিজেপির রাজনৈতিক উত্থানের জমিতে সার-জল দিয়েছে। আজ আমরা তার ফল ফলতে দেখছি। আবার, জাতীয় স্তরে খ্রিস্টানরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হলেও; খ্রিস্টানদের বিভিন্ন প্রার্থনাসভায় আক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে যা প্রকাশ পাচ্ছে; কেরলে কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিজেপি খ্রিস্টানদের একটা অংশের সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সবশেষে এটাই বলার যে, মুসলিমদের প্রান্তিক করার কাজ চলতে থাকবে। সমাজে মেরুকরণকে আরএসএস যতটা গভীরে প্রোথিত করেছে, তাকে উৎখাত করা সহজ নয়। আরএসএসের কাজকর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি লিখেছিলেন তওদের সমস্ত বক্তব্য সাম্প্রদায়িক বিষে পরিপূর্ণ; যে বিষের ফলশ্রুতিতে আজ দেশকে গান্ধিজির অমূল্য জীবন বলিদান দিতে হল।দণ্ড১ঞ্চ আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিসরের এই বিষাক্ত দিকটিকে খর্ব করা বা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তো হয়ইনি, বরং আমাদের সমাজের ধর্মীয় বিভাজনের যাবতীয় ক্ষেত্রগুলিকে ব্যবহার করে এটি এখন এক বহু শাখাপ্রশাখা-যুক্ত বিষাক্ত আগাছায় পরিণত হয়েছে। সমাজে গেঁড়ে বসা এই বিপুল ঘৃণাকে উৎখাত করতে না পারলে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নের ভারত গড়তে পারব না।

[১] ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘ পরিবারকে নিষিদ্ধ করার পর লেখা।

** নিবন্ধটি সেকুলার পার্সপেকটিভ-এ গত ১৩ জুন ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়।(৪নম্বর প্ল্যাটফর্মের সৌজন্যে প্রাপ্ত)*

জরুরি অবস্থা বনাম মোদী জমানা এবং ফ্যাসিবাদ

নন্দন রায়

(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার গত দশ বছরে সংবিধান লঙ্ঘন করে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত সংসদে দেড় শতাধিক সাংসদকে সাসপেন্ড করে ন্যায় সংহিতা নামক জনবিরোধী ফৌজদারি বিধির প্রবর্তন করেছেন। এবার মোদীর উদ্দেশ্য ছিল বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এসে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান বদলে দেওয়া। সেটা হয়নি। মোদী প্রায়শই ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলের জরুরি অবস্থার কথা বলে সংবিধান লঙ্ঘনের উদাহরণ দেন। ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। ২১ মাস পর তিনি জরুরি অবস্থা রদ করে নির্বাচন করান, কিন্তু পরাজিত হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। মোদী গত দশ বছর ধরে দেশে কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করে রেখেছেন। সমস্ত স্বশাসিত সংস্থার স্বাধীনতা হরণ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নন্দন রায়ের ২০০৮ সালে লিখিত প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় প্রকাশ করলাম।এটি দ্বিতীয় কিস্তি।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২

গণমাধ্যমের ভূমিকার ওপরে উল্লিখিত পরিবর্তনের পেছনে আছে দুই সরকারের অবস্থানগত পার্থক্য।জরুরি অবস্থার জমানায় ও বর্তমান জমানায়, যার কয়েকটির উল্লেখ আমরা আগের অনুচ্ছেদেই করেছি। কিন্তু কেন এই পার্থক্য? ইন্দিরা সরকার কর্পোরেট দুনিয়ার থেকে এক ধরনের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে একটা প্রগতিশীল কর্পোরেট স্বার্থসাধনবিমুখ ভাবমূর্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু মোদী সরকার নিজেকে প্রায় প্রতিষ্ঠাই করে ফেলেছে কর্পোরেট স্বার্থের অংশীদার হিসেবে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোন সরকারকেই মোদী সরকারের মতো এতটা কর্পোরেট স্বার্থের সেবাদাসত্ব করতে দেখা যায়নি। আদানির এরোপ্লেনে চড়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করতে আসেন যাতে প্রথম দিনেই বুঝিয়ে দেওয়া যায় আগামী দিনগুলিতে তিনি কাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বিপরীতে আমরা দেখেছি পণ্ডিত নেহরুকে, যিনি বিড়লাদের আর্থিক সাহায্য প্রত্যাখান করেছিলেন, অসুস্থ মৃত্যুমুখী স্ত্রী কমলা নেহরুকে বিদেশে চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়ার সময়। এমনকী তিনি শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি নিতে না চাওয়ায় তিনি জেলে ছিলেন। তাঁর কন্যা ইন্দিরা মা ‘ র সঙ্গে যান।

মোদী জমানাতেই আমরা লক্ষ্য করি, সংখ্যালঘুদের প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের সর্বদাই যে ঘৃণার মনোভাব ছিল, তা যেন

বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল। সবসময়েই তাদের প্রতি একটা নেতিবাচক, চেপে ধরার, জব্দ করার অথবা বাগে পাওয়ার মতো মনোভাব। দেশের যাবতীয় দুর্দশার মূলে রয়েছে হতভাগ্য মুসলিম সম্প্রদায় এমন একটা বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, ইন্দিরার রাজত্বে জনতার বিশেষ একটা অংশ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ইন্দিরা গান্ধির রোষের শিকার হয়েছে যারা তাঁর অথবা তাঁর নানান স্বৈরতান্ত্রিক কর্মের মূল পরিচালক পুত্র সঞ্জয় গান্ধির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এই দমনের পেছনেও এমন কোনো সুপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদি ও কুমতলবি কার্যসূচি ছিল না যা ইতিহাসকেও নিজের মতো করে সাজানোর চেষ্টা চালাবে, পৌরাণিক অতিকথাকে বসাবে ইতিহাসের আসনে, অথবা বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'জন্ম-দোষী' সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে নতুন করে আখ্যানমালা সাজাতে বসবে। এবং রাষ্ট্রশক্তিকে সেই বিকৃত আখ্যানমালা প্রচারের কাজে এমনভাবে ব্যবহার করবে যে, একেবারে পাঠশালার বাচ্চারাও সে কাহিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলবে। অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি ঘৃণাটাকে জীবনের শুরুতেই একেবারে বোধের গভীরে প্রোথিত করে দেওয়ার এই প্রকল্প আসলে গোটা সমাজের ফ্যাসিবাদীকরণ ঘটানো যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় 'এই সরকারের পরে আর কোনো সরকার নেই'। এটাই মোদী সরকারের বিপজ্জনক আসল চেহারা।

ষষ্ঠত, মোদী জমানার এই দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে যুক্তিহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, যৌক্তিকতাকে বা তার্কিক বিশ্লেষণের বদলে বিশ্বাসকে অগ্রাধিকার দেওয়া, উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অথবা যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কথার সংগতির প্রতি এক উদাসীন অবজ্ঞা। এই প্রবণতা আগে শুধু বিজেপি-আরএসএস চক্রের একচেটিয়া ছিল, এখন ক্রমে তা সরকারি আমলাদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস পর্যন্ত এই প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে পারছে না তার প্রমাণ আমরা কিছুদিন আগেই পেয়েছি।

সপ্তমত, মোদী জমানা সমস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরকার নিয়ন্ত্রিত উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এদের অবস্থা এখন এমনই যে দেহটি ধরে রাখতে হলে মাথাটি বন্ধক দিতে হবে, আর মাথাটি বন্ধক দিলে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। সরকারি অর্থ পেতে গেলে রাস্তাটা এমনই দুস্তর। অতীত অভিজ্ঞতার সাথে এ এক সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। যদি কেউ তার চিন্তাশীল অস্তিত্বটিকে রক্ষা করতে চায়, তবে তার গায়ে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে জাতীয়তা বিরোধী তকমা, অথবা আরবান নকশাল অথবা টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং এবং আরও কত কী।

তাহলে জরুরি অবস্থার সঙ্গে মোদী জমানার ফারাকটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম জরুরি অবস্থা ছিল এক অতিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির স্বৈরাচারী দমন সমাজ ও মানুষের ওপরে। পুঁজিবাদের বিকাশে লজিক বনাম গণতান্ত্রিক রাজনীতির দাবিগুলির সঙ্ঘাতই যে এর কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবুও এই অবস্থা নিজেকে সরাসরি কর্পোরেট শাসন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেনি। মোদী জমানায় অতিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির স্বৈরাচারী দমনের সাথে সাথে আরও বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হলাম, আর তা হল সমাজের একটা অংশকে আরেকটা অংশের সাথে লড়িয়ে দেওয়া। এইভাবে দেশজোড়া ঘৃণার সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে মোদী সরকার ভালোই সাফল্য অর্জন করেছে আর এই সামাজিক অস্থিরতার আড়ালে কর্পোরেট স্বার্থপূরণে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। জরুরি অবস্থার সঙ্গে মোদী জমানার পার্থক্যটা এককথায় দাঁড়াল স্বৈরাচারের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের। পাঠক উত্তেজিত হয়ে এক্ষুনি পাল্টা প্রশ্ন করবেন, তাহলে ফ্যাসিবাদ কি স্বৈরতন্ত্র নয়? এর উত্তর অবশ্যই 'হ্যাঁ', ফ্যসিবাদ আরও বেশি স্বৈরতন্ত্র , সবচেয়ে প্রকাশ্য, সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও সবচেয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ব। ইন্দিরা গান্ধি যখন তার শাসনকালের দু'বছর গদি রক্ষার জন্য সংবিধান অনুমোদিত পথে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন এবং তা প্রত্যাহারও করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধির দৌড় ওই পর্যন্তই। কিন্তু মোদী সেখানে সংবিধান বহির্ভূত পথে ২০১৪ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক জরুরি অবস্থা জারি না করেও আরও বেশি দমনমূলক কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করছেন একাদিক্রমে গত ১০ বছর যাবৎ। গুজরাটে তিনি এই পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন গত ২৪ বছর ধরে।একথা ঠিক যে জরুরি অবস্থার সময়ের দমনের খতিয়ান ও কারারুদ্ধ মানুষের সংখ্যার হিসেব করলে বর্তমান জমানার চেয়ে হয়তো বেশিই দেখাবে। কিন্তু দমনের যে সম্ভাব্য কৌশলের ছক এই সরকার কষেছে তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি জরুরি অবস্থাকে অনেক অনেক দূর ছাপিয়ে যায়।

যেমন ইউএপিএ আইনকে এমন কঠোর ভাবে সংশোধন করা হয়েছে যে জামিন পাওয়া অসম্ভব করে তোলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা বদল করা হয়েছে যে স্রেফ

সন্দেহের বশে যে কাউকে সন্ত্রাসবাদী বলে গ্রেপ্তার করা যায়। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির কাজের পরিধি বাড়িয়ে এমন করা হয়েছে যে দেশের যে-কোনো স্থানের যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো সময়ে হানা দিতে পারে রাজ্যের কোনো অনুমতি ব্যতিরেকেই। এছাড়া সিএএ-এনআরসি, দেওয়ানি অপরাধের বিষয় তিন তালাক কে ফৌজদারি অপরাধের তকমা দেওয়া, বিধায়ক কেনাবেচা করে একের পর এক সরকারের পতন ঘটিয়ে জনাদেশ উলটে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটানো, এমনকি সংবিধানের যে basic structure কোনো সংসদ কোনো সংখ্যাধিক্যেও সংশোধন করতে পারে না, তার উল্লংঘন করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ করা হল। এবং সেই ঘৃণ্য কাজে মদত দিল বিরোধী দলের সাংসদরা -কেউ ওয়াক-আউট করে, কেউ বা আরো সরাসরি-সরকারি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ১৯৪৭ -২০২৪

শুভ বসু

বর্তমানে ভারত বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক যে খুব স্বাভাবিক নয়, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার নানাবিধ ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কারণ রয়েছে। বাংলাভাগ হবার পর সেকালে দুই বাংলায় দাঙ্গা হয়েছে ১৯৫০ ও ১৯৬৪ সালে। এর মধ্যেও অজস্র সংখ্যালঘু নিপীড়ন হয়েছে, দু দেশ থেকে দেশান্তরিত হয়েছেন বহু মানুষ। ফলে তিক্ততার একটি প্রেক্ষাপট ছিলই।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে দেশের ১৯৪০ এর দশকের ইতিহাস এর পাঠ জাতীয় আবেগের কারণে ভিন্ন। ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্ব একটি ঘৃণ্য মতাদর্শ আর বাংলাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর কোনো বিদ্বেষ নেই। তাঁদের মূল ধারার ঐতিহাসিকদের বক্তব্য লাহোর সিদ্ধান্তে ১৯৪০ সালে একাধিক সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান।

দু দেশের জনগণের মধ্যে ভাব হয়েছে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালে। তখন পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। দুই বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বাড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তির শাসনের উপর দুই পাকিস্তানে পুঞ্জীভূত হয় অসন্তোষ। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের দুই অংশে গণ বিক্ষোভ হয়। মার্কিন মদত পুষ্ট সেনানায়ক আয়ুব খানের পতনের পর প্রেসিডেন্ট হন ইয়াহিয়া খান। তিনি পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন করেন। তাতে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল ভাবে জয়লাভ করেছিল।পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানের জাতীয় মহাসভায় আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পান নি। পশ্চিম পাকিস্তানে মূল দল হিসাবে নির্বাচিত হয় পিপল'স পার্টি। জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁদের নেতা নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ চাইছিলেন পাকিস্তান একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রে (ফেডারেশন) পরিণত হোক আর পাকিস্তানের সামরিককর্ত্তারা এবং ভুট্টো এর বিরোধী ছিলেন। শেখ মুজিবুর জাতীয় মহাসভার সংসদের অধিবেশনের দাবিতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করেন। কিন্তু সামরিক জুন্টা সে কথা না শুনে তাদের উপর ভয়াবহ দমন পীড়নের রাস্তা নেন। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে বিদ্রোহ হয় তার নামই 'মুক্তি যুদ্ধ'। ২৫ শে মার্চ রাত্রে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি পাকিস্তানের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন । সেই সময় ঠান্ডা যুদ্ধের কারণে পাকিস্তান আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিক্সন এবং বিদেশ সচিব কিসিঞ্জারের নির্দেশে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির প্রয়াস করেন। চীন এই কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিসিঞ্জারের দৌত্যে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ লাভ করে ১ অক্টোবর ১৯৭১ সালে। চীন একই সময়ে রাষ্ট্র সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে একটি ' অক্ষশক্তি ' গড়ে ওঠে।

সেই প্রেক্ষাপটে (মার্কিন- চিন- পাকিস্তান অক্ষ- শক্তি) ১৯৭১ সালের ৯ অগাস্ট ভারত - সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন - এর সঙ্গে এই চুক্তি করা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইন্দিরা গান্ধী তা উপলব্ধি করেন। তার ফলে আন্তর্জাতিক ঠান্ডা যুদ্ধে যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় তার ফসল বাংলাদেশ।

ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সূচনার খবরের উপর নজর রাখলেও তখন পুরো ঘটনাবলীর মোর কোন দিকে নেবে তা বুঝতে সময় নেন। তাঁদের উদ্বেগ ছিল

পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে । পশ্চিমবঙ্গ তখন ছিল ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য। ১৯৭১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে নির্বাচনে মার্কসবাদীরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (প্রাপ্ত আসন ১১৪) হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সরকার গঠন করতে পারেন নি। কংগ্রেস ১০৫ টি আসন পেলেও সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও নির্দলীয়দের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করে। তখন কেন্দ্রীয় শাসন চলছে এবং দেওয়ালে দেওয়ালে সি.পি.আই(এম) দল লিখতো ‘পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রের উপনিবেশে পরিণত হতে দেব না।’ ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে নকশালবাড়িতে জঙ্গী কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে সিপিআই (এম.এল) দল গঠিত হয়েছে ও তাঁরা সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছে।তার ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী (CRP) ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস (EFR) সক্রিয় হয়েছে নকশাল দমনে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও বিদ্রোহ হয়েছে । যদি নকশালরা তাদের সঙ্গে যোগ দেন বা সিপিআই(এম)যদি তাদের সমর্থন করেন তাহলে ভারতের উভয় সংকট। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র নেতারা এবং আওয়ামী লীগ সেই দ্বন্দ্বের সমাধান প্রথম থেকেই করেন। তাঁদের যে পতাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিবাস ইকবাল হলে আঁকা হয় এবং শিবনারায়ণ দাস যে পতাকা অঙ্কন করেন তাতে বাংলাদেশের সোনালী রঙের মানচিত্র ছিল শুধু পূর্ববাংলার।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরাতে যে আবেগের বিকাশ দেখা যায় তা অভূতপূর্ণ। ১ কোটি শরণার্থীর খাবার যোগান দরিদ্র ভারতবাসীরা। অনেকেই উৎসাহিত ছিলেন স্বাধীন বাংলার হয়ে যুদ্ধে যাবার। একটি বাঙালি ভাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। ভারত সরকার এতে খানিকটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসারের ব্যক্তিগত ডাইরি পড়লে বোঝা যায় সে কথা। কিন্তু সেই ছিল ভারত বাংলার প্রেমের রূপকথা। প্রত্যেক পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালি মুজিবনগর সরকারের বেতার সূচি অনুষ্ঠান শুনতেন, আবেগে ভাসতেন রবীন্দ্রনাথ নজরুলের ভাষার অবমাননার কথা শুনে, বাঙালি হত্যার প্রতিশোধে উদ্দীপ্ত হতেন। এর আগে এবং পরে যাঁরা বলতেন ‘আমি বাঙালি ও মুসলমান’ তাঁরাও সেই সময় নিজের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন পূর্ব বাংলার থেকে আগত মুসলমান বাঙালি অতিথি চর্চায়। ভারতে এবং পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে এটা একটা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে গেছে । ভারতে মনে করা হয় আমরা ওদের বিপদের দিনে দাঁড়িয়েছি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিয়েছে। ওদের সরকার কলকাতায় আশ্রিত ছিল। তাঁরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবে।

আসলে কিন্তু মুক্তি যুদ্ধ বহু পর্য্যায়ে হয়েছে। একদল মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা ছিলেন মাওবাদী সিরাজ সিকদারের দলের লোক তাঁরা ভারতের ছায়া পর্যন্ত মাড়ান নি। একই কথা বলা চলে হায়দার আকবার খান রনো এবং কাজী জাফর দের বাহিনী সম্পর্কে। তাঁরা মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশের শিবপুরে নিজস্ব ঘাঁটি খুলেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদীর)। সিপিবি র নিজস্ব বাহিনী ছিল।আবার আওয়ামী পন্থী ছাত্র নেতা টাইগার সিদ্দিকী টাঙ্গাইল সেক্টরে লড়াই করেন। ছাত্র লীগের অন্য নেতারা কলকাতায় সেনাপতি উর্বানের ছত্র ছায়ায় বসে ছায়া যুদ্ধ করেছেন কিন্তু তাঁরা মুক্তি যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন নি। এঁরাই পরে জাসদ এবং বেশির ভাগই রক্ষী বাহিনীর সদস্য হন। তবে মওলানা ভাসানী কলকাতায় ছিলেন। আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন খালেদ মুসারাফ, জিয়া-উর-রহমান, শফিউল্লাহ প্রমুখ। তাঁরা সেনাপতি ওসমানী র অধীনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লড়াই করেছিলেন। আর এই বিরাট কর্মকান্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ কলকাতায় থিয়েটার রোডে তাঁর অফিস বসে। কিন্তু বাংলাদেশের সেনা বাহিনীর মধ্যে একটি ক্ষোভ তখন থেকেই ছিল। তাঁরা যুদ্ধ করবেন আর নেতারা গৌরবের আলোয় আলোকিত হবেন তাঁরা কেউ কেউ তা পছন্দ করেন নি। ২৭ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাপতি জিয়া নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করে ফেলেছিলেন। তবে ভারত যুদ্ধে যাবার ফলে এবং যুদ্ধে সাহায্য করার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল সন্দেহাতীত ভাবে। তবে মুক্তি যুদ্ধের যে চিত্র আমরা দেখি বা যে রূপকথা শুনি তা অনেকাংশে সত্য হলেও পুরোপুরি সত্যি নয়।

মুক্তি যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয় ভারত বাংলা দ্বন্দ্ব। বাঙালি অফিসার মেজর জলিল বন্দি হন এই বলে যে ভারতীয় সেনারা কেন পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্ম সমর্পনের অস্ত্র পাবেন তাই নিয়ে। শেখ মুজিব দেশে ফেরেন ৭২ এর

জানুয়ারি মাসে এবং তাঁর অনুরোধে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে আওয়াজ ওঠে ভারতের সঙ্গে চুক্তির বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের তিন দিক জুড়ে ভারত। ভারত বাদ দিলে মিয়ানমারের সঙ্গে তার সীমানা একান্ত সীমিত। ফলে নদীর জলের প্রবাহ, বাণিজ্য, খ্যাদ্যবস্তুর আদান প্রদান, মানুষের চলাচল সবের মধ্যে ভারতের ছায়া থাকে আর তার ফলে ভারতের উপর রাগ থাকে অনেক মানুষের। পদ্মা নদীতে কেন বাঁধ দেওয়া হলো তাই নিয়ে বাংলাদেশের জননেতা মৌলানা ভাসানী বিপুল মানুষ জন নিয়ে ফারাক্কা লং মার্চ করলেন ১৯৭৬ সালে। আবার মুজিব ১৯৭৪ সালে যখন লাহোর ইসলামিক সামিট এ যান তখন ভারত তার বিরোধী ছিল। শেখ মুজিব নাকি বলেছিলেন 'শেখ মুজিব কারো সাজা হুকোয় তামুক খায় না।'

কিন্তু শেখ মুজিবকে প্রায় সপরিবারে হত্যা করার পর বাংলাদেশে নতুন রাজনীতির অভিমুখ তৈরী হলো। প্রথমত বাংলা ভাষা নিয়ে পুরোনো সাংস্কৃতিক প্রশ্ন যা ১৯৪০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটির সদস্যরা তুলেছিলেন যে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির অভিঘাত বঙ্কিম শরৎ রবীন্দ্রনাথের ধারা থেকে মুক্ত করে আনতে হবে তা আবার সচল হয়। আর দুই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের পুনর্মূল্যন করতে হবে এরম দাবি ওঠে। এর মধ্যে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনকারীদের উত্তরপূর্ব ভারত থেকে হঠাতে হবে বলে ভারতে আন্দোলন হয়ে গেছে। যদিও উত্তরপূর্বের মানুষ জন বাংলাদেশি বলতে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষ কে বোঝেন এবং ত্রিপুরাকে তাঁরা উদাহরণ হিসাবে দেখান যে কি ভাবে বাংলাদেশী আসায় তাদের জনগোষ্ঠীর ভারসাম্য বদলে গেছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ আসামের উলফা র নেতারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। আর ভারত আশ্রয় দেয় শান্তিবাহিনীর চাকমা নেতাদের যাঁরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতা চায়।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ আসার পরে সম্পর্কের উন্নতি হয়। কিন্তু এর মধ্যে ভারতে বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দেওয়া নিয়ে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। নথি বিহীন অভিবাসনকারীদের নিয়ে দুই রাষ্ট্রের মত পার্থক্য রয়েছে। তারপর ১৯৯৩ সাল থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমানায় কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছে। তারপরে শূন্য সহিষ্ণুতা ঘোষণা করে ভারত সীমানায় গুলি চালাতে পারে অভিবাসনকারীদের উপরে। বাংলাদেশীরা দাবি করেছেন প্রায় ১০০০ জন বাংলাদেশী মারা গেছেন সীমানা পার হতে গিয়ে ১৯৯৩ থেকে ২০১২' র মধ্যে। ফেলানী বলে এক পনেরো বছরের কিশোরী মারা গেছে ৭ জানুয়ারী ২০১১ সালে ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাঁটা তারের সীমানা আছে মেক্সিকোর সঙ্গে, তাতে নথীবিহীন অভিবাসনকারীরা পার হলে তাদের পুলিশ গ্রেফতার করে বিশেষ কারাগারে রাখেন এবং তাদের খাবার , জল পোশাক ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। ভারতের মতন গুলি চলেনা। মৃত্যুদণ্ড দিতে গেলে যে কোনো দেশে একটি বিশাল প্রক্রিয়া লাগে কিন্তু শূন্য সহিষ্ণুতা মৃত্যুদণ্ড বাংলাদেশীরা মনে করেন অমানবিক।

২০১৪ থেকে ভারতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি বাংলাদেশিদের উইপোকার সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রকাশ্য জনসভায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদীজি সহ অনেকেই বলেছেন ভারতে ২০ কোটি বাংলাদেশী রয়েছে যা ভারতের মুসলমানদের সমান সংখ্যক। এবার নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদী ক্রমাগত তাঁর বক্তৃতায় মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী বলে দেগে দিয়েছেন ।বাংলাদেশেও এই সময়ে আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় দালালদের নির্মূল করার কথা বলে হয়েছে। মূল বিরোধী দল বিনপির সভায় এবং প্রচার মিছিলে বলা হয়েছে ' ভারত যার মামা বাড়ি বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি।'

উভয় দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গী পাল্টেছে। ভারতে গুজরাট সহ কয়েকটি রাজ্যে প্রশাসনের প্রশ্রয়ে দাঙ্গা হয়েছে । বাংলাদেশেও ১৯৭৫ সালের পর সামরিক শাসনে ও বি.এন.পি -জামাত জোটের শাসনে সম্পত্তি লুঠ এবং দাঙ্গার খবর পাওয়া গেছে। ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুদের দেশত্যাগের খবর পাওয়া গিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্রমশ চীনের উপর আর্থিক ভাবে নির্ভরশীল হয়েছে বড় বড় প্রজেক্ট করতে এবং অস্ত্র ক্রয় করতে। আমেরিকার সরকার তাতে শংকিত হয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছেন আর ভারত (ইউ.পি.এ. সরকারের আমলে) তার প্রতিবাদ করেছে। আর বাংলাদেশের জনগণ মনে করেছেন আওয়ামী লীগের অস্বচ্ছ নির্বাচন করে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা ভারতীয়দের কাজ। ইতিমধ্যে তিস্তা নদীর জল বন্টন নিয়ে কোনো চুক্তি হয় নি। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ট্রানসিট চুক্তি করলেও ভারত শিলিগুড়ি দিয়ে নেপালের থেকে বা

বাংলাদেশের থেকে নেপালের মধ্যে যানবাহনের চলাচলের উপর কোনো ট্রানসিট চুক্তি করে নি। আর এই মুহূর্তে কোটা সংস্কার আন্দোলনে সরকার গুলি চালনার ফলে ভারতের প্রতি তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার এক বিরাট জনগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ কে ভারতের দালাল বলে মনে করে।বাংলাদেশের মূল ইসলামপন্থী দল জামাত এ ইসলামী ভারতের বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রচার করেন , যদিও তাঁদের শক্তি সীমিত। বি.এন.পি. ভারত বিরোধী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী অবস্থান প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছে। আওয়ামী লীগের মধ্যেও ভারতের প্রতি অসন্তুষ্ট শক্তি আছে। ভারতে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন রয়েছে। ফলে দু দেশের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে অন্তত ২০০ জনের মৃত্যু

সারা দেশে সংঘর্ষে ২৪ জুলাই পর্যন্ত অন্তত ২০০ জন নিহত হবার খবর পাওয়া গেছে। ১৯ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট ১১ জনের মরদেহ রাখা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছিলেন হাসপাতালটির পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া। জেনে নেওয়া দরকার বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আসলে কি এবং কেন।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাপদ্ধতি সংস্কার নিয়ে আন্দোলন ও নানা ধরনের আলোচনা চলছে। তবে এখন থেকে দেড় দশক আগে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কোটা সংস্কার বা কোটা প্রয়োগের পদ্ধতি সহজ করার সুপারিশ করেছিল। যদিও তখন সেই সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। তবে ২০18 সালে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনের একপর্যায়ে ওই বছর নবম থেকে ত্রয়োদশ গ্রেডের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) সব কোটা বাতিল করে পরিপত্র জারি করা হয়।

পিএসসির পুরোনো বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কোটা প্রয়োগের পদ্ধতির ওপর বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শেষে কোটা প্রয়োগের পদ্ধতি সহজ করার বিষয়ে ২০০৯ সালের মার্চে সরকারের কাছে কিছু সুপারিশ করেছিল পিএসসি। ওই সুপারিশের মধ্যে ছিল মুক্তিযোদ্ধা, নারী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার কোটাগুলো জাতীয় পর্যায়ে বণ্টন করা যেতে পারে। অর্থাৎ ওই কোটাগুলোকে পুনরায় জেলা বা বিভাগভিত্তিক ভাগ করা যাবে না বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য পদের সর্বোচ্চ সংখ্যা দিয়ে সীমিত করা যাবে না। এ ধরনের কোটার পদগুলো জাতীয়ভিত্তিক নিজস্ব মেধাক্রম অনুযায়ী ওই কোটায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা যেতে পারে।

পিএসসির ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে কোটার প্রয়োগকে অত্যন্ত জটিল, দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার উল্লেখ করে পিএসসি বলেছিল, কোটা প্রয়োগের পদ্ধতি সহজ করা একান্ত আবশ্যক। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল, কোটাপদ্ধতির জটিলতার কারণে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন শতভাগ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব। প্রার্থীদের বিভিন্ন ক্যাডারের চাকরির পছন্দক্রম এবং কোটার সঙ্গে বিভিন জেলা বা বিভাগের জন্য আরোপিত সংখ্যাগত সীমারেখা সংযুক্ত হয়ে এমন একটি বহুমাত্রিক সমীকরণ কাঠামোর সৃষ্টি করেছে, যার নির্ভুল সমাধান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় অসম্ভব। এই জন্য পিএসসি বলেছিল, কম সময়ে ও সুচারু এবং নির্ভুলভাবে বিসিএস পরীক্ষাসহ নন-ক্যাডারে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা প্রয়োগের পদ্ধতি সহজ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় কোটা প্রয়োগসংশ্লিষ্ট জটিলতা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। পিএসসির ২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনেও একই ধরনের সুপারিশ করা হয়েছিল।পিএসসির তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত সরকারি চাকরির ২০ শতাংশ পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। বাকি ৮০ শতাংশ পদে নিয়োগ হতো কোটায়।

১৯৭৬ সালে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ৪০ শতাংশে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে ৪৫ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নিয়ম চালু করা হয়। বাকি ৫৫ শতাংশ অগ্রাধিকার কোটায় নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ যোগ করে মোট কোটা দাঁড়ায় ৫৬ শতাংশ।

বাছাই, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করার পর কোটা বিবেচনা করার নিয়ম। একসময় কোটার অনেক পদ শূন্য থাকত। যদিও পরে নিয়ম চালু করা হয়; কোটায় পদ পাওয়া না গেলে তা মেধাতালিকা থেকে পূরণ করা হবে। নবম থেকে

১৩তম গ্রেডে নিয়োগে কোটা বাতিল সংক্রান্ত ২০১৮ সালের পরিপত্র গত ৫ জুন অবৈধ ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। রায়ের মূল অংশ গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। এই রায়ের মূলকথা হলো, সব কোটা বজায় রাখতে হবে। তবে প্রয়োজনে বাড়ানো-কমানো যাবে। অবশ্য আপিল বিভাগ কোটার বিষয়ে পক্ষগুলোকে চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সরকারি সূত্রগুলো বলছে, এখন সরকারের ভেতরও কোটা সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে যেহেতু নির্বাহী বিভাগের একটি সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাওয়া হয়েছে, তাই আদালতের সিদ্ধান্তের পরেই সরকার এ বিষয়ে করণীয় কিছু করতে পারে বলে মনে করে সরকার।

আপিল বিভাগের রায়ের আগে সরকার কোটা পরিবর্ধন-পরিমার্জন নিয়ে কিছু করবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, সরকারি চাকরিতে কোটার বিষয়টি বিচারাধীন বিষয়, আইনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। গত শনিবার আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের অনেক দাবি ও বক্তব্য সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বিরোধী। সাংবিধানিক রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির আওতায় প্রণীত কোনো সরকারি নীতি শিক্ষার্থীদের একটা অংশের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে না। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা সংবিধানের আলোকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা-সম্পর্কিত সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। অথচ গত কয়েক বছরে কোটা না থাকায় সরকারি চাকরিতে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তি হতাশাজনকভাবে কমে গেছে। পুলিশে মাত্র চারজন নারী কর্মকর্তা নিয়োগ পেয়েছেন। পররাষ্ট্র ক্যাডারে পেয়েছেন দুজন। ৫০টি জেলার নারীরা ক্যাডার পাননি। ২৩ জেলা থেকে কেউ পুলিশ ক্যাডার পাননি।

শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা সব গ্রেডে কোটা সংস্কারের দাবি করছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও বলছেন, কোটা পুরোপুরি বাতিল না করে সময়ের বিবেচনায় সংস্কার করা উচিত। সরকারি চাকরিতে কোটা পুরোপুরি বাতিল না করে সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংস্কার করা উচিত বলে মনে করেন চাকরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ মিয়া। তবে তাঁর ভাষ্য, কোটার বিষয়টি এখন আদালতে বিচারাধীন। তাই আদালতই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন।

২০১৮ সালে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনের একপর্যায়ে নবম থেকে ১৩তম গ্রেডের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) সব কোটা বাতিল করে সরকার। বাতিলের আগে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের নেতৃত্বে যে কমিটি করা হয়েছিল, তারা এই পাঁচ গ্রেডে কোটা বাতিলের সুপারিশ করেছিল।

ওই কমিটি কোটা বাতিলের ফলে কোটার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করে পাওয়া পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ারও সুপারিশ করেছিল। এর মানে হলো, ওই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কোটা পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে ওই কমিটি তিনটি সুপারিশ করেছিল।

প্রথম সুপারিশ ছিল, নবম থেকে ১৩তম গ্রেডে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া। দ্বিতীয় সুপারিশ ছিল, এসব গ্রেডে বিদ্যমান কোটাপদ্ধতি বাতিল করা এবং তৃতীয় সুপারিশ ছিল, কোটা বাতিলের ফলে কোটার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ে পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া; অর্থাৎ প্রথম দুটি সুপারিশের মূলকথা হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে কোটা থাকবে না। এসব পদে নিয়োগ হবে সরাসরি মেধার ভিত্তিতে। আর ওই কমিটির তৃতীয় সুপারিশটির ব্যাখ্যা হলো, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় যে কোটা অপরিহার্য, তবে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে। বিষয়টি অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শেষের সুপারিশের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে ওই কমিটির প্রধান সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম গত শুক্রবার ‘প্রথম আলো ‘কে বলেন, সেই সুপারিশের ব্যাখ্যা হলো, কোটা বাতিলের পর কী প্রভাব পড়েছে, সেটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা।প্রয়াত মন্ত্রিপরিষদ সচিব আকবর আলি খান ও সাবেক সচিব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ ২০০৮ সালে বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে কোটাব্যবস্থার ওপর গবেষণা করে তা কমানোর সুপারিশ

করেছিলেন। ওই গবেষণায় বলা হয়, অগ্রাধিকার কোটা কোনোভাবেই মেধা কোটার চেয়ে বেশি হতে পারে না। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) উদ্যোগে ওই গবেষণা করা হয়েছিল। যদিও সেই গবেষণার সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি।

সরকারি চাকরিতে ২০টি গ্রেড আছে। সরাসরি নিয়োগ হয় মূলত নবম থেকে ২০তম গ্রেডে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত এসব চাকরিতে মোট ৫৬ শতাংশ কোটা ছিল। ওই বছর নবম থেকে ১৩তম গ্রেডের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) সব কোটা বাতিল করা হলেও ১৪তম থেকে ২০তম গ্রেডে (মূলত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) কোটা আগেও ছিল, এখনো আছে। যদিও প্রতিষ্ঠানভেদে এসব পদের কোটায় কিছু ভিন্নতা আছে। আকবর আলি খান ওই গবেষণার বাইরেও কোটা সংস্কারের বিষয়ে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন। তিনি একবার বলেছিলেন, ২৫৮ ধরনের কোটা আছে। চাকরিতে এই কোটাব্যবস্থা অবশ্যই সংস্কার করা উচিত।

(প্রথম আলো এবং বিবিসি -র প্রতিবেদন থেকে)

গভীর সঙ্কটে বাংলাদেশ ঃ কোটা সংস্কার আন্দোলন বাহন মাত্র, আসল লক্ষ্য ছিল হাসিনা সরকারের পতন।

মনিরুল হক

গত কয়েকদিনে ধরে বাংলাদেশে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে তা আমাদের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অনেকদিন শান্ত থাকার পর সে দেশে এখন আবার শুরু হয়েছে গুলি, বোমা, আগুন , হঠকারীতা আর অরাজকতার রাজনীতি। এ রাজনীতিতে মানুষ হয়ে পড়ে গৌণ, যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতা দখলই হয়ে ওঠে মূখ্য। আর সার্বিকভাবে দেশ হয়ে পড়ে সঙ্কটাপন্ন। তবে কোনও রাজনৈতিক বিষয় যতই জটিল হোক না কেন আমরা তাকে সহজ করে দেখতেই বেশি পছন্দ করি। নানান স্বার্থচিন্তা, ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বৈদেশিক চাপ, সেই চাপকে মেনে নেওয়া বা অস্বীকার করা এরকম অসংখ্য তরঙ্গের ওঠাপড়ার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয় রাজনীতির জটিল গতিপথ। এই গতিপথের কোন কোন বাঁকে এসে আমরা থমকে দাঁড়াই। বাঁকের আগে অতিক্রান্ত পথটা সেখান থেকে আর দেখা যায় না, পথটা কোন দিকে যাবে সে নিয়ে ভাবার অবকাশও আমরা খুঁজি না। এমনই একটি বাঁক হল সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠিত হওয়া বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন। দ্রুত থেকে দ্রুততর হওয়া এই আন্দোলনের পট পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের অভিঘাতে আমাদের মনোজগতের তন্ত্রীগুলি এমনভাবে তছনছ হয়ে গেছে যে এই আন্দোলনের প্রেক্ষিত, তার ধারা, আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা, আওয়ামী লিগ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা আমরা বিবেচনার মধ্যে আনছিই না। এমনকি সেই মুক্তিযুদ্ধ, যার ভিত্তির উপরেই গঠিত হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ, তাও আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনছি না।

মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পেলেন এক সমস্যা জর্জরিত দেশ। দেশের পুণর্গঠন ছিল অতীব কঠিন একটি কাজ। একদিকে নিন্দিত রাজাকারদের যেমন তিনি শাস্তি দিতে চাইলেন না, তেমনি অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক - মজুর - জেলে - তাঁতি এবং অন্যান্যদের জন্য সরকারী চাকুরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক জুন্টা প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির সাহায্যে তাঁকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিল। ওই সময় এই উপ-মহাদেশ জুড়ে মার্কিন মদতপুষ্ট প্রতিক্রিয়ার শক্তি ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবকে তাদের প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিল। মনে আছে শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার(দেশে না থাকায় তাঁর দুই কন্যা রক্ষা পান) পর ১৭ আগস্ট (১৬ আগস্ট এখানে সংবাদপত্র বন্ধ থাকে) কলকাতার প্রধান দৈনিকের শিরোনাম ছিল 'পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেখ মুজিব নিজ গ্রামে সমাধিস্থ'। ওই সংবাদ পড়ে মনে হয়নি তাঁকে সপরিবারে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই ছিল আমেরিকান Game Plan. এর তিন মাস পরে ৩ নভেম্বর সামরিক জুন্টার নেতৃত্বে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলীকে হত্যা করে। এইবার এই হত্যালীলার অন্যতম চক্রী খন্দকারকে সরিয়ে ক্ষমতার দখল নেন জিয়াউর রহমান। জন্ম নেয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে বাংলাদেশ নেশনালিস্ট পার্টি।

ওই সময় থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত (১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল বাদে, ওই ৫ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল) যাঁরা বাংলাদেশ শাসন করেছেন তাঁরা হয় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অথবা মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা তৈরি হল ১৯৯৬ সালে

আওয়ামী লিগ নতুন করে ক্ষমতায় আসার পরে। ততদিনে অনেক মুক্তিযোদ্ধাই হয় পরলোকগমন করেছেন অথবা তাঁদের সরকারী চাকরীর বয়স পেরিয়ে গেছে। এসবের জন্য কোটা আইন একাধিকবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। চাকরি না পাওয়া, বয়স পেরিয়ে যাওয়া এসব কারণে ১৯৯৭ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং ২০১১সালে তাঁদের নাতি - পুতিদের এই কোটার আওতায় আনা হয়।

আলোচ্য ছাত্রদের আন্দোলন ছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল, মুক্তিযোদ্ধা তথা তাদের পরিবারের জন্য সরকারী চাকরিতে যে ৩০ শতাংশ কোটা চালু আছে তা বাতিল করতে হবে। ২০১৮ সালেও এ নিয়ে আন্দোলন হয়। ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়ে সরকার কোটা বাতিল করে দেয়। কিন্তু এর পর মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। সেই মামলার প্রেক্ষিতে এবছর ৫ জুন হাইকোর্ট কোটা ব্যবস্থা পুনরায় চালু করতে বলে। সঙ্গে সঙ্গেই সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আপীল করে কোটা বন্ধের পক্ষে। এই আপীলের শুনানির দিন ধার্য হয় ৭ অগাস্ট। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশেষ আদালত বসিয়ে এই মামলার রায় দেওয়া হয় গত ২১ জুলাই। বলা বাহুল্য সরকারী চাকরির ৯৩ শতাংশ কোটামুক্ত রেখে ৫ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা, ১ শতাংশ উপজাতি ও ১ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

হ্যাঁ, কোটা ব্যবস্থা আওয়ামী লিগ চালু করেছে। কিন্তু যখনই তা সংস্কারের দাবি উঠেছে সরকার তা মেনে নিয়েছে। কি ২০১৮, কি ২০২৪ ছাত্রদের মেজাজ বুঝে সরকার ছাত্রদের পক্ষেই থেকেছে। ঘটনার গতি-প্রকৃতি দেখে বোঝাই যাচ্ছিল কোটা ব্যবস্থার সংস্কার হবেই। তাহলে এই উগ্র, এই অনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন কেন সংগঠিত হল? এই আন্দোলন কার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরিচালিত করা হল? কেন এতো মরীয়া হয়ে, এতো দ্রুত এই আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল? সময় কি কমে যাচ্ছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না, যা কিছু ক্ষতি-নাশকতার কাজ বিদ্যুৎ গতিতে সেরে ফেলতে হবে, এটাই কি ছিল পরিকল্পনা? কারা ছিলেন এই পরিকল্পনার অংশীদার?

গত ১৪ জুলাই তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে এই কোটা সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, '২০১৮ সালে আন্দোলনের সময় রাস্তায় ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী,মানুষের উপর হামলা, মিথ্যাচার সহ বিভিন্ন কারণে বিরক্ত হয়ে তখন কোটা বাতিল করে দিয়েছিলাম। আর এখন বিষয়টা শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন রয়েছে। আদালত শিক্ষার্থীদের বলেছে, তাদের কোন বক্তব্য থাকলে তারা শীর্ষ আদালতে গিয়ে জানাক। যতক্ষণ পর্যন্ত শীর্ষ আদালত থেকে সমাধান না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই'। প্রশ্নচ্ছলে তিনি এও বলেন- মুক্তিযোদ্ধাদের উপর ছাত্রদের এতো রাগ কেন। কেন কোটার সুযোগে ভর্তি হয়ে ছাত্ররা এখন কোটার বিরোধীতা করছে। তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন- 'কোটার সুযোগ মক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারদের নাতি-পুতিরা পাবে।'

অনেকে বলছেন শেখ হাসিনার এই শেষ বাক্যটাই নাকি ছাত্রদের তাতিয়ে দিয়েছে। স্পষ্ট করে বলা ভালো- না, তা নয়। বিষয়টা এতটা সরল নয়। আসল কারণ নিহিত অন্য জায়গায় ।আবার একটা পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৭৫ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান নিজের সরকারী বাসভবনে প্রায় গোটা পরিবার সহ খুন হলেন। সেই কিশোর বয়সেই বুঝেছিলাম বিষয়টা ছিল এক গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের ফল। কিন্তু কলকাতার এক নামী দৈনিকে বিখ্যাত সাংবাদিক কয়েক কিস্তি এক্সক্লুসিভ গপ্পো লিখে বোঝালেন খুনের চক্রান্তের ব্যাপারটা ছিল এক ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের ফল ! আসলে গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে বাংলাদেশে চলছে একটি স্থায়ী সরকার। অনুন্নত দেশের তকমা খুলে সে এখন উন্নয়নশীল তথা অগ্রগামী একটি দেশ। উন্নতি হয়েছে দেশের মানুষের জীবনমানের। বহির্বিশ্বেও স্বমহিমায় উজ্জ্বল এই দেশ। আন্তর্জাতিক প্রভুরা হাজার চেষ্টা করেও জব্দ করতে পারছে না হাসিনা সরকারকে। বহুকোটি মানবসম্পদ আর উর্বর ভূমির এই দেশ স্ট্রাটেজিক দিক থেকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে ভারত, চিন সহ সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন শেখ হাসিনা। ভোট বয়কট করে বিরোধীরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন দেশের রাজনীতিতে। তাই কি ছাত্রদের আন্দোলনকে সামনে দেখে জেগে উঠছে বাসনা? চরম দক্ষিণপন্থী এবং ঘোর মৌলবাদী জামাত-ই-ইসলামীর সঙ্গে তাল দিয়ে বি এন পি চেষ্টা করেছে আন্দোলনকে বিপথগামী করতে। সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক তান্ডব,ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, লুঠতরাজ করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। সরকারী

টেলিভিশন ভবন দখল করতে গেছে, বিমানবন্দর অবরোধ করতে ছুটেছে, এমন কি জেল ভেঙে দাগী আসামীদেরও বার করে নিয়ে গেছে। কোটার নথিপত্র তো আর ওইসব জায়গায় ছিল না! পদ্মা সেতু নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগে তুলে বিশ্ব ব্যাংকের সরে দাঁড়ানো সত্বেও নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশের ওই সেতু নির্মাণে মৌলবাদী শক্তি ক্ষিপ্ত। এখন তাদের প্রচার ভারতের স্বার্থে নাকি পদ্মার ওপর রেল সেতু নির্মাণ হয়েছে। আসলে ছাত্র আন্দোলন চলে গিয়েছিল রাজনৈতিক দুষ্কৃতিদের হাতে। তাদের লক্ষ ছিল সারা বাংলাদেশ জুড়ে এক চরম অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে শেখ হাসিনাকে গদিচ্যুত করা।

১৪ জুলাই শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনের পরেই কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা সারা রাত ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আওয়ামী লীগপন্থী 'ছাত্র লীগ' এই বিক্ষোভের বিরোধিতা করে। ফলস্বরূপ ঢাকা, চট্টগ্রাম রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগ বিতাড়িত হয়। দেশের প্রধান শহরগুলির রাজপথ তথাকথিত মেধাপন্থী ছাত্রদের অধিকারে চলে আসে। ছাত্র বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ১৭ জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষনে শেখ হাসিনা সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেন নি। ছাত্রবিক্ষোভ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে এবং নেতৃত্বের অযোগ্যতা ও অপরিণামদর্শিতায় তা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে, সহিংস রূপ নেয়। মিটিং মিছিলের পাশাপাশি সংগঠিত হয়েছে অরাজকতা, ভাঙচুর,অগ্নি সংযোগ সম্পত্তিনাশের অসংখ্য ঘটনা। সবচেয়ে বড় কথা সংঘর্ষ-প্রতিরোধে মৃত্যু বরণ করেছেন অন্তত দুইশত মানুষ যাদের অধিকাংশই ছাত্র-ছাত্রী। একথা পরিস্কার করে বলা দরকার এই মৃত্যুমিছিলকে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। মৃতদের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

এই আন্দোলনের অন্যতম পরোক্ষ ইস্যু ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের পণ্যবাহী রেল চলাচলের ব্যবস্থা অনেকের মনপুত হয় নি। নতুন করে মংলা বন্দর ব্যবহারের অধিকারও পাচ্ছে ভারত। কিন্তু তিস্তা নদীর জলবন্টন নিয়ে কোনও চুক্তি হয়নি। তবে ভারতের আশ্বাসের ভিত্তিতে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তিস্তার ওপর ব্যারেজ নির্মাণ ভারতের সঙ্গে যৌথ ভাবে করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার এতো বছর পরে বাংলাদেশের এক ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এখনও ভারত বিদ্বেষী। নতুন প্রজন্মের মধ্যেও তা বহমান। ছাত্র আন্দোলনে এই বিদ্বেষের প্রবাহ লক্ষ্য করা গেছে। অনেকে বলবেন, বর্তমান ভারত সরকারের মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার নীতিই এর জন্য দায়ী।

এবারের এই ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনাবলী অনুধাবন করলে দেখা যাবে ছাত্রসমাজ আন্দোলন পরিচালনায় দূরদর্শিতার প্রমাণ দিতে পারেন নি। বহু ছাত্র নিহত হয়েছেন, বহু ছাত্র আহত হয়েছেন, দেশের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। তাঁদের আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে জামাতী - বিএনপিরা দেশকে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে। তবে তাঁদের এই আন্দোলন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে দল হিসাবে আওয়ামী লিগের ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং হাসিনা সরকারের ফাঁক-ফোকর।

মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিকাঠামোগত সম্পদের যে ক্ষতি পরিকল্পিত এই হঠকারী আন্দোলনের ফলে হয়েছে তা হয়ত আগামী দিনগুলিতে পূরণ করা যাবে কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে আগামী দিনে শেখ হাসিনার সরকারকে যে সব বিষয়গুলির উপর নজর দেওয়া উচিত সেগুলি হলঃ

এক ঃ দুর্নীতি, স্বজনপোষন, আত্মতুষ্টিতে ভোগা দলের নেতা কর্মীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া।

দুই ঃ বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান অসহায়তার মোকাবিলা করা।

তিন ঃ দেশের চরম দক্ষিণপন্থীদের ছোঁয়া থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতাকে রক্ষা করা।

চার ঃ বিদেশি কোন রাষ্ট্র, সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন তার কাছে আত্মসমর্পণ না করা।

বাংলাদেশের কোটা আন্দোলন ও কিছু আনুষঙ্গিক কথা

মজিবুর রহমান

অবিভক্ত বাংলার রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের একটা ইতিহাস ছিল।১৯৪৭ সালে ভারত তথা বঙ্গবিভাজনের পর থেকে পূর্ববঙ্গে সেই পরম্পরার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন বিশ্ববাসীকে ১৯৫২ সালে এক রক্তস্নাত ২১শে ফেব্রুয়ারি উপহার দেয় যা ২০০০ সাল থেকে

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে নতুন দেশ বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বিগত অর্ধ শতাধিক বছরে বহুবার বাংলাদেশের রাজপথকে রক্তাক্ত আন্দোলনে ব্যস্ত হতে দেখা গেছে। ২০২৪ সালের 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিক সহিংস আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ সালেই সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ প্রথা প্রবর্তন করে। সংরক্ষিত আসন সংখ্যার শতাংশ নির্ধারিত হয় এরূপ মুক্তিযোদ্ধা-৩০, নারী-১০, জেলা-১০, জনজাতি-৫, প্রতিবন্ধী-১, মোট ৫৬ শতাংশ। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর দুই দশক ধরে এই সংরক্ষণ বা কোটা স্থগিত রাখা হয়। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করেন। মুক্তিযোদ্ধা থেকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পর্যন্ত কোটা সম্প্রসারিত করা হয়। ২০01 সালে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়ে কোটা প্রথা রদ করেন। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসেন এবং সেই সঙ্গে ফিরিয়ে আনা হয় সংরক্ষণ। ২০১১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিদেরও সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের তীব্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনা সরকার জনজাতির জন্য ৫ শতাংশ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষণ বজায় রেখে বাকি ক্ষেত্রগুলো থেকে সংরক্ষণ তুলে দেয়। ২০২১ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করা হয়। ২০২৪ সালের ৫ই জুন হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহালের পক্ষে রায় দেয়। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ পথে নামে। আবার কোটা সংস্কারের দাবি ওঠে।সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ভাবে বলা হয় যে, আদালতের রায় নিয়ে সরকারের কিছু করার নেই। কিন্তু আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করে। সুপ্রিম কোর্ট ১০ই জুলাই হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়ে ৭ই আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে। ১৪ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা অনুষ্ঠানে আন্দোলনকারীদের খুব কড়া ভাষায় সমালোচনা করার পাশাপাশি বলেন যে, সংরক্ষণ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিরা পাবে না তো কি রাজাকারদের নাতিপুতিরা পাবে? তাঁর এই মন্তব্য আগুনে ঘি ঢালার সামিল হয়। আন্দোলনকারীরা তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে স্লোগান দেয়, ক্ষুচাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার! তুই কে? আমি কে? রাজাকার রাজাকার! বলছে কে? বলছে কে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!ক্ষু আন্দোলন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। সুপ্রিম কোর্টে কোটা মামলার শুনানি এগিয়ে আনা হয়। ২১শে জুলাই সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকরিতে সাত শতাংশ কোটা রাখার কথা জানায়- মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে হাসিনা সরকার ২৩শে জুলাই প্রজ্ঞাপন জারি করে। কিন্তু সাত-আট দিনের আন্দোলনেই বাংলাদেশ কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। আবাসিক হলগুলো থেকে পড়ুয়াদের বের করে দেওয়া হয়।ভারত, নেপাল ও ভুটানের শিক্ষার্থীরা স্বদেশে ফিরে যান।গোলাগুলি, লাঠালাঠি, ইটপাটকেল ছোড়াছুড়িতে কমবেশি দুশো জন ছাত্র, পুলিশ ও সাধারণ মানুষ নিহত এবং দু'হাজার জন আহত হন। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে রীতিমতো ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। প্রচুরসংখ্যক সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা ও যানবাহনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়। তাণ্ডবের শিকার হয় রাজধানীর মেট্রোরেল, টোল প্লাজা, টিভি'র কার্যালয়, ইন্টারনেটের কার্যালয়, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, হাসপাতাল, কমিউনিটি সেন্টার। একটা জেলে হামলা চালিয়ে আটশো'র বেশি বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।পরিস্থিতি সামাল দিতে কারফিউ জারি করা হয়, সেনা নামানো হয়, দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে সরকারি চাকরির প্রধান পরীক্ষা বিসিএস বা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। এটা একটা ত্রিস্তরীয় পরীক্ষা যা সম্পন্ন হতে প্রায় দুই বছর সময় লাগে। প্রথম পর্যায়ে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এখানে যারা কোয়ালিফাই করে তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষায় বসে। এই মূল পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের তৃতীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকার বা মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হয়। বিসিএস পরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্যের হার মাত্র দুই শতাংশের মতো। এই পরীক্ষার কোনো পর্যায়েই চাকরিপ্রার্থীদের কোটাগত সুবিধা পাওয়ার সুযোগ

নেই। সুতরাং, চাকরির মেধা তালিকায় সত্যিকারের মেধাবী ছেলেমেয়েরাই ঠাঁই পায়। এজন্য কোটায় চাকরি প্রাপকরা একেবারে নিম্ন মেধার অথবা অযোগ্য, এমন মনে করা সঙ্গত নয়। ১৭কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে এখন সরকারি চাকরিতে ১৭ লক্ষ আসন রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের কম। এদিক থেকে দেখলে দেশের এক শতাংশেরও কম মানুষের জন্য চাকরিতে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও আন্দোলনে দুটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ হলো মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার। ইংরেজি 'ফ্রিডম ফাইটার' পশ্চিমবঙ্গে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হলেও বাংলাদেশে 'মুক্তিযোদ্ধা'। তবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে একটুখানি ফারাক আছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অহিংস ও সহিংস উভয় পথেই পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পুরোপুরি সহিংস। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কয়েক দশক ধরে চললেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মূলত ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। ১৯৭২ সালে ঘোষিত দ্য বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটারস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সংজ্ঞা অনুযায়ী, মুক্তিযোদ্ধা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত যেকোনো সংগঠিত ফোর্স বা দলের সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। কেউ যদি মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত কোনো সংগঠিত দলের সদস্য না হন অথবা হয়েও সক্রিয় ভূমিকা না রাখেন তবে তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হবেন না। শাসকদলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞাতেও পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের একাধিক তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু সেসব তালিকা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এবং বিতর্কের অবসান হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের একটি হিসাব অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধার সর্বোচ্চ সংখ্যা এক লাখ তিরাশি হাজার। এখন হয়তো বেঁচে আছেন এক লাখ এবং তাঁদের সকলেরই সরকারি চাকরি পাওয়ার বয়স পার হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলেমেয়েদেরও অধিকাংশের বয়স পার হওয়ার মুখে। এখন তাঁদের নাতিপুতিরা কোটার সুবিধা ভোগ করেন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু আওয়ামী লীগের বিরোধীদের একটা অংশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিল না। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে পাকিস্তানপন্থী বাঙালি এবং উর্দুভাষী অবাঙালি অভিবাসীদের নিয়ে '৭১ সালের মে মাসে খুলনায় গঠিত আধা সামরিক বাহিনী রাজাকার নামে পরিচিত হয়। রাজাকাররা পাক সামরিক বাহিনীকে বাংলাদেশে গণহত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মতো দুষ্কর্মে সহায়তা করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর রাজাকারদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পালায়।বিগত এক দশকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন রাজাকারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে দেখা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফার্সি রেজাকার শব্দের অর্থ হলো স্বেচ্ছাসেবক। রেজাকার অপভ্রংশে হয়েছে রাজাকার। বাংলাদেশে রাজাকার একটি অপমানসূচক শব্দ যার অর্থ বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক বা দেশদ্রোহী।আল বদর ও আল শামস নামে আরও দুটি আধা সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর প্রায় এগারো হাজার জনের একটি তালিকা ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার প্রকাশ করলেও নানা ভুল ও অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

বাংলাদেশের যেকোনো আন্দোলনে ভারত বিদ্বেষী স্লোগান উঠতে দেখা যায়। এবারও আন্দোলনকারীদের মিছিল থেকে আওয়াজ উঠেছে, 'ভারত যাদের মামাবাড়ি বাংলা ছাড় তাড়াতাড়ি।' আসলে শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ককে আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ভালো চোখে দেখে না। তারা অভিযোগ করে যে, হাসিনা ভারতের কথায় চলে। তাদের হাসিনা-বিরোধিতা ভারত-বিরোধিতায় পরিণত হয়।আবার বাংলাদেশে অনেক মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন আছে যারা মানসিকভাবে পাকিস্তানপন্থী। এরা সুযোগ পেলেই ভারতবিরোধী বক্তব্য পেশ করে। ক্রিকেট খেলাতে ভারতের পরাজয় ও পাকিস্তানের বিজয় কামনা করে। অনুরূপ কাণ্ডকারখানা অবশ্য ভারতেও ঘটতে দেখা যায়। এদেশের হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো কারণে অকারণে পাকিস্তানের প্রসঙ্গ টেনে আনে। পাকিস্তান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতলেও তাদের মুখ ভার হয়। যখন তখন বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ করা হয়। 'ঘুসপেটিয়া' বলে অপমান করা হয়।

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র এখনও যথেষ্ট বিকশিত হয়নি। এবছর জানুয়ারি মাসে টানা চতুর্থবারের মতো শেখ

হাসিনার সরকার গঠিত হয়। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। চল্লিশ শতাংশের কম ভোট প্রদত্ত হয়। বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা ও তা দমন করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভাবধারার অভাব অনুভূত হচ্ছে। বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো ছাত্রকে গুলি করে মেরে ফেলা কোনো সভ্য সমাজের পুলিশের কাজ হতে পারে না।স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও দেশবাসীকে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের সমর্থক হিসেবে বিভাজিত করা সমীচীন নয়।সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনে দুর্বৃত্তদের অনুপ্রবেশের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বকে এব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যাতে সম্পর্ক খারাপ না হয় তার জন্য উভয় দেশের নাগরিক সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আম্বানিদের বিবাহ অনুষ্ঠান বৈভবের নির্লজ্জ্ব প্রদর্শনী

শুভাশিস মজুমদার

সম্প্রতি বেশ কয়েকদিন ধরে মেনস্ট্রিম মিডিয়া (টিভি চ্যানেল), খবরের কাগজ বা সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই যে খবরটি মুখ্যত চোখে পড়েছে তা হল মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির বিবাহ অনুষ্ঠানের কাহিনী। এই আয়োজনের খুঁটিনাটি তথ্য ছবি সহযোগে প্রকাশিত হয়েছে, যেন দেশের এটাই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ খবর। এক ননস্টপ কার্নিভাল এর মত প্রায় সাত মাস আগে থাকতে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়, স্বয়ং মুকেশ আম্বানির সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধিকে তাঁদের বাসভবনে গিয়ে নিমন্ত্রণ করা। সকলের ঔৎসুক্য ছিল সনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধি এই অনুষ্ঠানে যাবেন কিনা ! শেষ পর্যন্ত দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে গেলেও সনিয়া এবং রাহুল অনুপস্থিত থেকেছেন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও যাননি এই অনুষ্ঠানে। সাধারণভাবে এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া বা না হওয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে এই বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে রাহুল ভাষণ দেওয়ার সময়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অভিযোগ করে বারবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রিয় দুই বন্ধু আদানি (গৌতম) ও আম্বানি (মুকেশ) কে সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দিচ্ছেন এমনকি দেশের সম্পদ বেসরকারিকরণের মাধ্যমে তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ভারতজোড়ো যাত্রা শেষে মুম্বাইয়ের জনসভায় রাহুল বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদী এই সরকারের মুখোশ, আসলে সরকার পরিচালিত হচ্ছে আদানি-আম্বানিদের দ্বারা। গত লোকসভার প্রচারকালে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছিলেন যে আদানি আম্বানি টেম্পু ভরে টাকা কংগ্রেসকে দিচ্ছেন।

মুখ্য বিষয়টি হচ্ছে আম্বানি পরিবারের এই বিবাহকে ঘিরে দেশের মধ্যে এতো আড়ম্বরপূর্ণ প্রচার, বলা যায়, এই প্রথম। এর আগে মুকেশ আম্বানির আরও দুই সন্তানের বিবাহ হয়েছিল। যা এতটা প্রচারের আলোয় ছিল না। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বৈভবের প্রদর্শন চলল। যেন এই দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে কোন মানুষ বসবাস করেন না ! অথচ তথ্য দেখাচ্ছে, দেশের ৪০ শতাংশ সম্পদ মাত্র এক শতাংশ মানুষের হাতে, এতটাই আর্থিক বৈষম্য। দেশের ৮০ কোটি মানুষ খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সহায়তায় জীবন যাপন করে।

১২ জুলাই, শুক্রবার, মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে তারকাখচিত অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট। জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল সেলিব্রেটি, রাজনীতিবিদ এবং বিজনেস টাইকুনরা। বিয়েতে হাজির না হলেও এক দিন পরে অর্থাৎ শনিবার আর্শীবাদ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রধানমন্ত্রী নবদম্পতিকে আর্শীবাদ দেন। উপস্থিত ছিলেন কিম কার্দাশিয়ান, খোলো কার্দাশিয়ান, জন সিনা, রেমা, নিক জোনাসের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বরা। অনন্ত আম্বানি এবং রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের দিন মুম্বইয়ের রেড কার্পেটে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে হাজির ছিলেন স্বামী নিক জোনাস। পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দেওয়ার পরে, অভিনেতা এবং মার্কিন গায়কও উত্সবে হাজির ছিলেন নিজের গ্ল্যামারাস লুক নিয়ে। জাঁকজমকপূর্ণ এই বিয়ের অনুষ্ঠানে কোমর দোলাতে দ্বিধাবোধ করেননি নিক বা প্রিয়াঙ্কা কেউই। বিখ্যাত কসমেটিকস কোম্পানি হুডা বিউটি- র গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট মোনা কাট্টান ও তাঁর স্বামী হাসান এলামিন, জয় শেট্টি ও তাঁর স্ত্রী রাধিকা দেভলুকিয়া, ডব্লু ডব্লু ই রেসলার এবং অভিনেতা জন সেনা উপস্থিত ছিলেন।ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

বরিস জনসন এবং টনি ব্লেয়ার উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত ছিলেন বলিউডের এক ঝাঁক তারকা এবং সংগীত শিল্পীরা। দেশের হাইপ্রোফাইল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সপরিবারে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আর জেডি সভাপতি লালু প্রসাদ যাদব, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, এন সি পি (এসপি) নেতা শরদ পাওয়ার, সুপ্রিয়া শুলে, মধ্য প্রদেশের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা দ্বিগবিজয় সিং এবং কমল নাথ, সালমান খুরশিদ, অভিষেক মানু সিংভি, শচীন পাইলট, ডি কে শিবকুমার, উদ্ভব ঠাকরে, রাজীব শুক্লা, দেবেন্দ্র ফাড়নাবিশ, একনাথ সিন্ধে, প্রফুল প্যাটেল প্রমূখ।

এই বৈভব প্রদর্শনের আয়োজনে আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থিত ছিলেন দারোকা পিঠের শংকরাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী এবং জ্যোতির মঠের শংকরাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ।

দেশের সকল ক্ষেত্রের বিশিষ্টদের উপরে আম্বানির প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট দেখা গেল। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কমিউনিস্ট পার্টির কোন নেতা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। অনুপস্থিত ছিলেন দক্ষিণের দুই মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন এবং রেবেনত রেড্ডি। সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুপস্থিত ছিলেন সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। উল্লেখ্য মুকেশ আম্বানি নিজে গিয়ে গান্ধি পরিবারের এই নেতাদের নিমন্ত্রণ করে আসেন। সেই সময় সনিয়া গান্ধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলেও রাহুলের সাথে দেখা করতে তিনি ব্যর্থ হন। রাহুল সেই সময় দিল্লির উপকণ্ঠে বেশ কিছু রাজমিস্ত্রি এবং সহকারীদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

উল্লেখ করা যায় গত ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে অনন্ত আম্বানির বিবাহ অনুষ্ঠান (প্রি ওয়েডিং সেরিমনি) নিয়ে দেশে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ১ মার্চ, ২০২৪-এ, দ্য হিন্দুর অনলাইন সংস্করণ জাগৃতি চন্দ্রের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম 'অনন্ত আম্বানির প্রাক-বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য জামনগর বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে'। প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে যে কীভাবে সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা পরিচালিত গুজরাটের জামনগরের ছোট বিমানবন্দরটিকে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত দশ দিনের জন্য 'আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এটি করা হয়েছিল 'বিল গেটস, মার্ক জুকারবার্গ, রিহানা, ইভাঙ্কা ট্রাম্প এবং বেশ কয়েকজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মত ভি আই পি-দের স্বাগত জানানোর জন্য। এই ভি আই পি-রা নীতা ও মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠ সন্তান অনন্তের তিনদিনের প্রাক-বিবাহের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক-এর সক্রিয়তায় বিমানবন্দরে কাস্টম, ইমিগ্রেশন এবং কোয়ারেন্টাইন (সিআইকিউ) সুবিধা স্থাপন করা হয়।'

এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু মন্তব্য প্রকাশ পায় বলে সংবাদ প্রতিবেদনে জানা যায়। একদিকে, রাজনৈতিক শাসকদের সমর্থকদের দ্বারা এর পক্ষে একের পর এক যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করা হয়। বলা হয় যে কংগ্রেস সরকার ২০১১ সালে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে পাকিস্তানি দর্শকদের সুবিধার্থে একই কাজ করেছিল (কিন্তু তখন সেটি করা হয়েছিল একটি বড় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের জন্য, যা ছিল ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল, ব্যক্তিগত বিয়ের অনুষ্ঠান নয়)। আম্বানিদের স্তুতি করে বলা হয় যে আম্বানিরা হাজার হাজার ভারতীয়দের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া আগত ভিআইপিদের যথাযথ সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে হবে বলেও যুক্তি দেখানো হয়।

অন্যদিকে, ভয় এবং হতাশা প্রকাশ করে এক ঝাঁক সমালোচনামূলক মন্তব্য দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। একজন মন্তব্য করেছেন 'আদানি এবং আম্বানির জন্য ভারতে জীবন স্বর্গের মতো এবং আমাদের বাকিদের জন্য এটি নরক।' দ্বিতীয় একজন বলেছেন 'আমরা অনেক বড় অলিগার্চের (৯০ এর দশকে বেসরকারিকরণের সুযোগ নিয়ে রাশিয়ার যে সমস্ত ব্যবসায়ী রাতারাতি প্রভূত বিত্তবান হন) সাথে নতুন রাশিয়া...', তৃতীয় একজন কটাক্ষ করেছেন 'মহান উক্তি 'বসুধৈব কুটম্বকম', যার অর্থ 'বিশ্ব একটি পরিবার'; পরিবর্তিত অর্থ 'আমি, আমার ধনী বন্ধুরা এবং তাদের বন্ধুরা এক পরিবার'।

আম্বানি 'প্রি-ওয়েডিং' সম্পর্কে আরো একটি মন্তব্যে বলা হয়েছে যে জামনগর বিমানবন্দরে এই বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে '(তার)কারণ একটি অল্প বয়স্ক ধনী বাচ্চা সারা বিশ্ব থেকে কিছু বিখ্যাত প্রজাতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা দেখাতে চায়।' এর সমর্থনে, একই সঙ্গে

জামনগরে একটি হাতির সামনে ইভাঙ্কা ট্রাম্পের পোজ দেওয়ার ছবিগুলি পোস্ট করা হয়েছে।

উল্লেখিত ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানাটি 'রাধা কৃষ্ণ মন্দির এলিফ্যান্ট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' নামে একটি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ধর্মীয় নামযুক্ত সংস্থাটির পরিচালনায় চলা এই ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা এবং তার কর্মকাণ্ড নিয়ে ৯ মার্চ দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় রামচন্দ্র গুহ - র একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে জানা যায়, ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বন্য প্রাণী (সুরক্ষা) আইনের একটি সংশোধনী আনে, যা ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা তৈরির অনুমতি দেয় এবং হাতির মতো বিপন্ন বন্য প্রজাতিকে (জঙ্গল থেকে) আটক করা, পরিবহন করা এবং বিক্রয় করাকে উত্সাহিত করে। সেই সময়ে, রামচন্দ্র গুহ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী, প্রেরণা সিং বিন্দ্রা উল্লেখ করেছিলেন যে আগের এই আইনটি সুরক্ষিত প্রজাতির প্রাণীর বাণিজ্যিক লেনদেনকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু সংশোধনীর মাধ্যমে, 'জীবন্ত বন্দী হাতিগুলিকে এই সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হলো। এটি একটি সংরক্ষিত বন্য প্রাণী, হাতিকে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগ তৈরি করে দিল। এবং তাই, এই সংশোধন বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইনের মূল উদ্দেশ্য ও চেতনার সাথে বিরোধপূর্ণ। এটি আইনের একটি গুরুতর অসঙ্গতি যা সংশোধন করা উচিত।'

'স্বভাবতই, কারা ক্ষমতায় ছিল এবং কাদের স্বার্থ তারা চরিতার্থ করছিল, যে কারণে অসঙ্গতিটি সংশোধন করা হয়নি ! এর পরিণতি এখন আমাদের দেখতে হবে।' ২০২২ সালের জুনে দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি প্রতিবেদনে এক মাসে আটটি মামলা নথিভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে আসাম থেকে বন্য হাতি পাচার করার জন্য জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে জাল অনাপত্তি শংসাপত্র (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) ব্যবহার করা হয়েছিল। এই মামলাগুলির মধ্যে সাতটি ক্ষেত্রে জামনগরে আম্বানি-চালিত ট্রাস্টে হাতি পরিবহনের চেষ্টা করা হয়েছে, এই সম্পর্কিত। এই আটটি মামলা ছিল সূচনা মাত্র। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে, অনন্ত আম্বানি গর্ব করে বলেন যে রাধা কৃষ্ণ মন্দির এলিফ্যান্ট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এখন দুই শতাধিক 'উদ্ধার' করা হাতি রেখেছে। এই হাতিগুলি সত্যই পরিতক্ত বা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার করা কিনা তার সত্যতা যাচাই না করে গোদি মিডিয়া আম্বানিদের প্রশংসা সূচক প্রচার চালিয়েছে।

ওয়েবসাইট, নর্থইস্ট নাও-এর একটি তদন্ত রিপোর্ট জানিয়েছে যে এই 'সুস্বাস্থ্যের অধিকারী' এবং 'ভ্রমণের উপযুক্ত' হাতির অনেকগুলিকে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম এবং ত্রিপুরা থেকে জামনগরের 'আর কে টি ই ডব্লিউ টি'-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যা অসহায় প্রাণীর 'উদ্ধার'-এর চিরাচরিত ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং সন্দেহজনক।

এটি অনুমান করা হয়েছিল যে এই হাতিগুলির বেশিরভাগই অবৈধভাবে জঙ্গলে বন্দী হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মধ্যস্বত্বভোগীদের সহায়তায় 'ক্রয়' করা হয়েছিল।

নর্থইস্ট নাও-এর আরেকটি প্রতিবেদনে একটি প্রাণী অধিকার (রক্ষা) গোষ্ঠীর লেখা একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে প্রাকৃতিক আবাসস্থলের পরিবর্তন এবং বেআইনিভাবে এই পরিবহনের কারণে অল্পবয়সী হাতিদের কষ্টকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চিঠিটিতে ব্যাপক ভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য লেখা হয়েছিল 'আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তাজা ধরা বন্য হাতির অবৈধ ব্যবসাকে বৈধ করা হচ্ছে...'

রামচন্দ্র গুহ-র প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, একজন প্রাণী অধিকার কর্মী জানিয়েছেন, 'প্রকৃত অসহায় প্রাণীর পুনর্বাসন ও তাকে যত্ন নেওয়ার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানানো যায়। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক আবাসস্থল থেকে শত শত হাতি পরিবহনের কর্মকাণ্ড পুরনো পশু পাচার প্রক্রিয়াকেই সক্রিয় করেছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একদা, বন্য হাতিদের বন্দী করে মন্দিরে পাঠানো হত; এখন, তাদের জামনগরের এই ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় পাঠানো হচ্ছে। সম্মানিত পরিবেশবিদ, রবি চেল্লাম, আম্বানির চিড়িয়াখানাকে একটি ব্যক্তিগত 'স্ট্যাম্প সংগ্রহের' সাথে তুলনা করেছেন যা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে না।

বন্যপ্রাণী বিজ্ঞানী এবং সংরক্ষণকারীরা তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করে আম্বানিদের এবং তাঁদের সহায়তাকারীদের (সরকারের ভিতরে এবং বাইরে উভয়ই) কাছে উত্তর জানতে চেয়েছেন।

প্রথমত, কেন এতগুলি বন্য হাতি জামনগরে পরিবহন করা হয়, যা একটি শুষ্ক শিল্পাঞ্চল এবং পরিবেশগতভাবে আবাসস্থল হিসেবে এই প্রাণীদের পক্ষে অনুপযুক্ত ?

দ্বিতীয়ত, কেন এই ব্যবস্থাকে সুবিধা দানের জন্য একটি সমান্তরাল আইনি বন্দোবস্ত আছে?

তৃতীয়ত, হাতিদের নিরাপদ, সুরক্ষিত রাখতে, তাদের পছন্দের প্রাকৃতিক আবাসস্থলে এমন সুবিধা তৈরি করার জন্য রাজ্য বন বিভাগগুলির সাথে কাজ করা হয় না কেন?

এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তবে আম্বানিরা বা তাঁদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন, এমন সম্ভাবনা খুব কমই। রামচন্দ্র গুহ-র মতে, 'ব্যবসায়িক বিষয়ের পাশাপাশি পারিবারিক বিষয়েও, আদানি এবং আম্বানি উভয়েই 'মোদী সরকার কি গ্যারান্টি' উপভোগ করেন।'

দেখাই যাচ্ছে, এই জাঁকজমকপূর্ণ বৈভব প্রদর্শনীতে দেশের আমজনতার কোন স্থান নেই। চরম আর্থিক অসাম্য, বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি ও ৪৫ বছরের সর্বোচ্চ বেকারত্ব আমজনতা কে পিষে মারছে।

এমতাবস্থায় অনন্ত আম্বানির বিবাহ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থেকে রাহুল গান্ধি বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর লড়াইটা তিনি সততার সঙ্গেই লড়তে চান। আজকের দিনে সাহস এবং নৈতিকতার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব তিনি। মেনস্ট্রিম মিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যম কে ব্যবহার করে বিজেপি সুপরিকল্পিতভাবে রাহুল গান্ধির যে বিকৃত ছবি দেশের মানুষের মগজে প্রোথিত করেছে তার প্রভাব থেকে জনগণ ক্রমশ মুক্ত হচ্ছে। এখন তিনি সংসদে লিডার অফ অপোজিশন। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়া যাত্রার সুফল কমবেশি সমস্ত বিরোধী দল সদ্য ঘটে যাওয়া নির্বাচনে পেয়েছে। এমতাবস্থায় ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের বাকি রাজনৈতিক দলগুলির উচিত রাহুল গান্ধির সঙ্গে দৃঢ়তার সাথে সহাবস্থান করা, তাঁকে ব্যবহার করা নয়।

'নাগরিক' স্মৃতিচারণা ঃ
মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত

বনানী বিশ্বাস

পুরো নাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) রঙপুর শহর থেকে সাত মাইল দক্ষিণে মিঠাপুকুর থানার অন্তর্বর্তী পায়রাবন্দ গ্রামের জমিদার পরিবারে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে যে নবজাগরণের আলো আমাদের দেশে পৌঁছেছিল তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরি রোকেয়া। ওই দুই সমাজ সংস্কারের মতো তিনি প্রচলিত কুসংস্কার, অন্যায় অবিচার মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদের ভাষায় তিনি সরব ছিলেন।

পিতা জহিরুদ্দিন আবু আলি হায়দার সাবের এবং মাতা রাহাতুন্নেসা চৌধুরানি। রোকেয়ার নিজের দুই ভাই ও দুই বোন ছিল। দুই ভাই আবুল আসাদ মোহাম্মেদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিলুর রহমান আবু জায়গাম সাবের দুই বোন; করিমুন্নেসা ও হোমায়রা। রোকেয়ার পিতা বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি কুসংস্কার মুক্ত ছিলেন না। রক্ষণশীল ছিলেন বলেই তাঁর পরিবারে কঠোর পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। কেবল পুরুষদের সামনে নয়, অনাত্মীয়া মহিলাদের সামনেও পরিবারের মেয়েদের পর্দা মেনে চলতে হতো। তা থেকে শিশুরাও রেহাই পেত না। এ সম্পর্কে রোকেয়া বলেছেন, 'সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে কোনও কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই অথচ পর্দা করিতে হইতো।'

শিশু রোকেয়ার জীবনকাল কেটেছে কঠোর অবরোধের মধ্যে। লেখাপড়ার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পিতার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাননি। কোনও বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি। বাড়িতে দিনের বেলায় লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। দিনের শেষে রাত্রিতে গভীর অন্ধকারে মোমবাতি জ্বেলে বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের কাছে পাঠগ্রহণ করতেন। তাঁর কাছে শিখলেন ইংরেজি ভাষা আর বড়বোনের কাছে শিখলেন বাংলা ভাষা।

ষোল বছর বয়স ১৮৯৬ সালে খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ভাগলপুরের অধিবাসী সাখাওয়াত ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৭৮ সালে হুগলী কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। তারপর কৃষিশিক্ষার বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান। তিনি ছিলেন তেজস্বী সৎ মানুষ। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। প্রথম স্ত্রী একটি কন্যা রেখে অল্প বয়সে মারা যান। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছানো অবাঙালি সাখাওয়াতকে পাত্র হিসাবে মনোনয়ন করেন রোকেয়ার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের।

রূপ, যৌবন, জাগতিক গুণাবলীকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাণাধিক প্রিয় বোন যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে বিদ্যাচর্চা ও প্রতিভা

বিকাশের সুযোগ পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি কুসংস্কারমুক্ত, উদার, শিক্ষানুরাগী, ধীর স্থির সাখাওয়াত হোসেনকে অনিন্দ্যসুন্দর লাবণ্যময়ী রোকেয়া জীবনসঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করেন অবশ্য বোনের সঙ্গে আলোচনা করেই। পরমপ্রিয় বড় ভাইয়ের মনের বাসনা ব্যর্থ হয়নি। বিবাহিত জীবনে রোকেয়া বিদ্যাশিক্ষা ও সাহিত্যশিক্ষার জন্য স্বামীর কাছ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। দাদার কাছ থেকে যে ইংরেজি শিক্ষার হাতেখড়ি হয়, স্বামীর কাছে তা পূর্ণতা পায়। স্বামীর প্রচেষ্টায় তিনি উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া এই দুই ভাষাতে লিখতে পড়তে শিখেছিলেন। স্বামীর নির্দেশে ইংরেজি চিঠিপত্রের উত্তর লিখে দিতেন। বিয়ের পর ভাগলপুরে স্বামীগৃহ এবং স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই কাটান। এই সময়ে রোকেয়ার লেখা নবনূর, মহিলা, নবপ্রভা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পদ্মরাগ একমাত্র উপন্যাস এই সময়েই রচনা করেন। মাদ্রাজের কমলিয়া নাথান ও সরোজিনী নাইডু সম্পাদিত Indian Ladies Magazine-এ তাঁর Sultanays Dream নামক অনবদ্য কাল্পনিক কাহিনিও প্রকাশিত হয়।

রোকেয়ার জীবনে এল চরম দুর্যোগ। দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হলেন সাখাওয়াত হোসেন। চোখ দুটি নষ্ট হয়। অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যাতে দিন কাটে। চিকিৎসার জন্য স্বামীকে কলকাতায় আনা হলো। কোনও লাভ হলো না। ১৯০৯ সালের ৩ মে তিনি প্রিয়তমাকে নিঃসঙ্গ করে চলে গেলেন।

তাঁদের দাম্পত্য জীবনের সময়কাল মাত্র তেরো বছর। রোকেয়া দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, কেউ বাঁচেনি। স্বামীর মৃত্যুর পর সৎকন্যা ও জামাতার নিগ্রহ শুরু হলো সম্পত্তির কারণে। মাত্র ২৯ বছর সম্পূর্ণ ভিন জীবনের পথ চলা শুরু হলো; অচেনা নতুন জগতে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে চললেন রোকেয়া। ভাগলপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাহ আবদুল মালেকের সরকারি বাসভবন গোলকুঠিতে ১৯১০ সালের ১ অক্টোবর রোকেয়া স্বামীর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে। তার মধ্যে চারজনই মালেক সাহেবের কন্যা। মিতব্যয়ী সাখাওয়াত হোসেন মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য রোকেয়াকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। স্বামীর ইচ্ছা পূরণ করতে এবং নিজের বাসনাকে বাস্তবায়িত করতে নতুন জীবন শুরু। ভাগলপুরের বাস ছাড়তে হলো শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের কারণে। ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় মালেক সাহেবের ছোট ভাই সৈয়দ আবদুস মালেকের বাড়িতে আশ্রয় নেন।

১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনে বাড়ি ভাড়া করেন। সেই বাড়িতে ৮ জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিনিও থাকতেন। ৯ মে ১৩নং ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৫ সালে ডিসেম্বরে পঞ্চম শ্রেণি শুরু হয়। উচ্চ প্রাইমারি স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯১৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হলো ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে হ'ল ৮৪ জন। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে ছাত্রী সংখ্যা ১০৫ জন। ১৯২৭ সালে ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৩৩। ১৯৩২ সালে ১৬২নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুলটির স্থান বদল হলো। ১৯৩৫ সালে ১৯ ডিসেম্বর সরকারি আদেশ অনুসারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল সরকারি বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। স্কুলটির নাম হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়। স্কুলটি আজ পশ্চিমবাংলার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম।

১৯১৬ সালে রোকেয়া 'অঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান নারী সমাজের কল্যাণ সাধনই ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। পশ্চাৎপদ নারী সমাজকে সচেতন করতে এবং অসহায় নারীদের সাহায্যার্থে এই সংস্থা গড়ে উঠেছিল। তিনি খিছলেন সাধারণ সম্পাদিকা। সভানেত্রী ছিলেন আয়েষা খাতুন। সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে 'নারীতীর্থ' প্রতিষ্ঠা করেন ডা. লুৎফার রহমান; রোকেয়াকে এই প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী নিয়োগ করেন। দীর্ঘদিনের প্রথাবদ্ধ সংস্কার, অন্ধত্ব জড়তার বিরুদ্ধে রোকেয়া একাই লড়াই করেছেন। ১৯০৪ সাল থেকে লেখা শুরু করেন, আমৃত্যু তিনি সাহসের সঙ্গে লিখেছেন। তাঁর রচনার মূল কেন্দ্র ছিল নারী। ধর্মীয় গোঁড়ামি অন্ধ কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে মানুষ হিসাবে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সমাজের রক্ত চক্ষুকে অগ্রাহ্য করেই। রোকেয়ার প্রকাশিত গ্রন্থ পাঁচটি; মতিচূড় (প্রথম খণ্ড ১৯০৪) Sultanays Dream (সুলতানার স্বপ্ন) (১৯০৮), মতিচূড় (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২২) পদ্মরাগ (১৯২৪) এবং অবরোধ বাসিনী (১৯৩১)।

রোকেয়ার লেখা গ্রন্থগুলি পড়লে তার মধ্যে প্রতিবাদী

মানসিকতার পরিচয় পাই; যা আজও মনকে নাড়া দেয়। আজকের সময়ের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, আনন্দের সঙ্গে কিভাবে মিশে যায় আজ থেকে একশো বিয়াল্লিশ বছর আগেকার রমণীর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা; ভাবলে অবাক হতে হয়।

কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের প্রতি লিঙ্গ বৈষম্য আজও সমাজে চলছে। এই বৈষম্যের কথা রোকেয়া রূপক কাহিনি 'মুক্ত ফল' লিখেছেন। সেখানে কাঙালিনী তাঁর কন্যা সন্তানদের উপেক্ষা করে স্নেহমমতা পুত্র সন্তানদের উজার করে দিলেও মৃত্যু শয্যায় পুত্র সন্তানরা মুক্ত ফল আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত দুই কন্যা সন্তান মাতার আরোগ্য বিধানের জন্য সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ভাইদের সঙ্গে মুক্ত ফল আনতে সক্ষম হয়। কাঙালিনীর সুদীর্ঘ নিরাশ যামিনীর অবসান হলো। রোকেয়া বলতে চেয়েছেন নারীরা সমাজে উপেক্ষিত। নারীপুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারীকে বঞ্চিত করলে চলবে না তাকেও পুরুষের সমান সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে কীভাবে নারীপুরুষের সমান হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে? 'স্ত্রী জাতির অবনতি" প্রবন্ধে তিনি পথের সন্ধান দিয়েছেন "যদি স্বাধীনভাবে উপার্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জজ; সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পর লেডি ভাইসরয় হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে রানি করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই? পা নাই? নাকি বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমার স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারি না?" সমাজে নারীর স্বাধীন পদচারণার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও আর্থিক স্বনির্ভরতা। নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন সমাজের অর্ধাংশকে পঙ্গু করে অগ্রসর হওয়া যায় না। বিবাহ একমাত্র নারীদের জীবনের লক্ষ্য নয়, নারীকে স্বাবলম্বী হতে হবে। সে নিজের পথ নিজেই স্থির করবে। নিজের শক্তি সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয় অর্জন করতে হবে। পরনির্ভর জীবন অবমাননাকর। এটাই পদ্মরাগ উপন্যাসের মূল কথা। রোকেয়ার ব্যতিক্রমী চরিত্রের বিশেষত্ব এখানে।

রোকেয়ার জীবনের স্বকীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর স্বদেশপ্রেম। তিনি ভারতবর্ষ নামক দেশকে ভালোবেসেছিলেন। দেশবাসীকে ভালোবাসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশের সব মা'কে বলেছিলেন তাঁরা যেন সন্তানকে শেখায় তারা প্রথমে ভারতবাসী;তারপর হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি। রোকেয়া পদ্মরাগ' উপন্যাসে 'তারিণী ভবন'কে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে দেখিয়েছেন। সকল ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে সান্তিতে বসবাস করে; এটা যেন রোকেয়ার স্বপ্নের ভারত। রোকেয়া চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিমদের ঐক্য দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন। বিদ্বেষ, ঘৃণা ত্যাগ করে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন; এটা তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন যে, রোকেয়া মুসলমান সমাজের কল্যাণেই তাঁর জীবনের কর্মপন্থা স্থির করেছিলেন। এটা ভ্রান্ত ধারণা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দুর তুলনায় মুসলমান সমাজ অনগ্রসর। দেশের উন্নতিকল্পেই পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। রোকেয়ার জীবনের আদর্শ ছিল মানবকল্যাণ। সেই লক্ষ্যে পথের বাধাগুলিকে অতিক্রম করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। নির্ভীক কণ্ঠে নিজের প্রত্যয়কে বাস্তবায়িত করেছেন।

রোকেয়াকে 'নারীবাদী' বলা হয়; এটা সঠিক নয়। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরোধিতা করেছিলেন;সকল পুরুষের বিরুদ্ধে সমাজে প্রচলিত অন্যায় রীতিনীতি, বিধিনিধান ও আচার-আচরণকে সমালোচনা করেছেন। চিন্তার জগতে তিনি এক আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

১৯৩২ সালের ৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি রচনা করেছিলেন "নারীর অধিকার" নামক প্রবন্ধটি। অসমাপ্ত থেকে গেল অনেক কাজ। ৯ ডিসেম্বর ভোরে শরীরে একটু যন্ত্রণা, তারপরে সব শেষ। সংগ্রামী জীবনের অবসান। অসংখ্য মানুষের অন্দরে-অন্তরে সেদিন বেজেছিল বেদনাবীণা। সেদিনটি ছিল বাঙালি জাতির অপূরণীয় ক্ষতির দিন। (মীরাতুন নাহার)

কারও সেবা নিতে হয়নি, আত্মনির্ভরশীল রোকেয়া নিজের ওপর নির্ভর করে বেঁচেছিলেন, চলেও গেলেন সেইভাবে। রোকেয়ার সমাধি হলো কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের পানিহাটিতে তাঁর আত্মীয়বর্গের পুরাতন গোরস্থানে। আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে তাঁর শবদেহ সোদপুরে নেওয়া হয়।

('গণশক্তি'তে প্রকাশিত)